১৯১৩-২০১৩ 1913-2013
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

# পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Fortnightly Ahmadi

নব পর্যায় ৭৬ বর্ষ | ১ম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ৩১ আষাঢ়, ১৪২০ বঙ্গাব্দ | ৫ রমযান, ১৪৩৪ হিজরি | ১৫ ওয়াফা, ১৩৯২ হি. শা. | ১৫জুলাই, ২০১৩ ঈসাব্দ

## এ সংখ্যায় রয়েছে-

* হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা
* রমযান মাসের ফযিলত ও বরকত
* রমযান আধ্যাত্মিক জগতের বসন্ত
* হযরত মুহাম্মদ (সা.) খাতামান্ নবীঈন কেন?
* শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)
* ধর্ম কর্মে সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত মানুষের কথা
* রোযা খোদা তা'লার জন্যই আর তিনিই এর প্রতিদান

অগণিত রহমত ও বরকতের মাস রমযানুল মুবারক!
হে খোদা! তোমার রহমত ও বরকত থেকে আমাদের বঞ্চিত করো না।

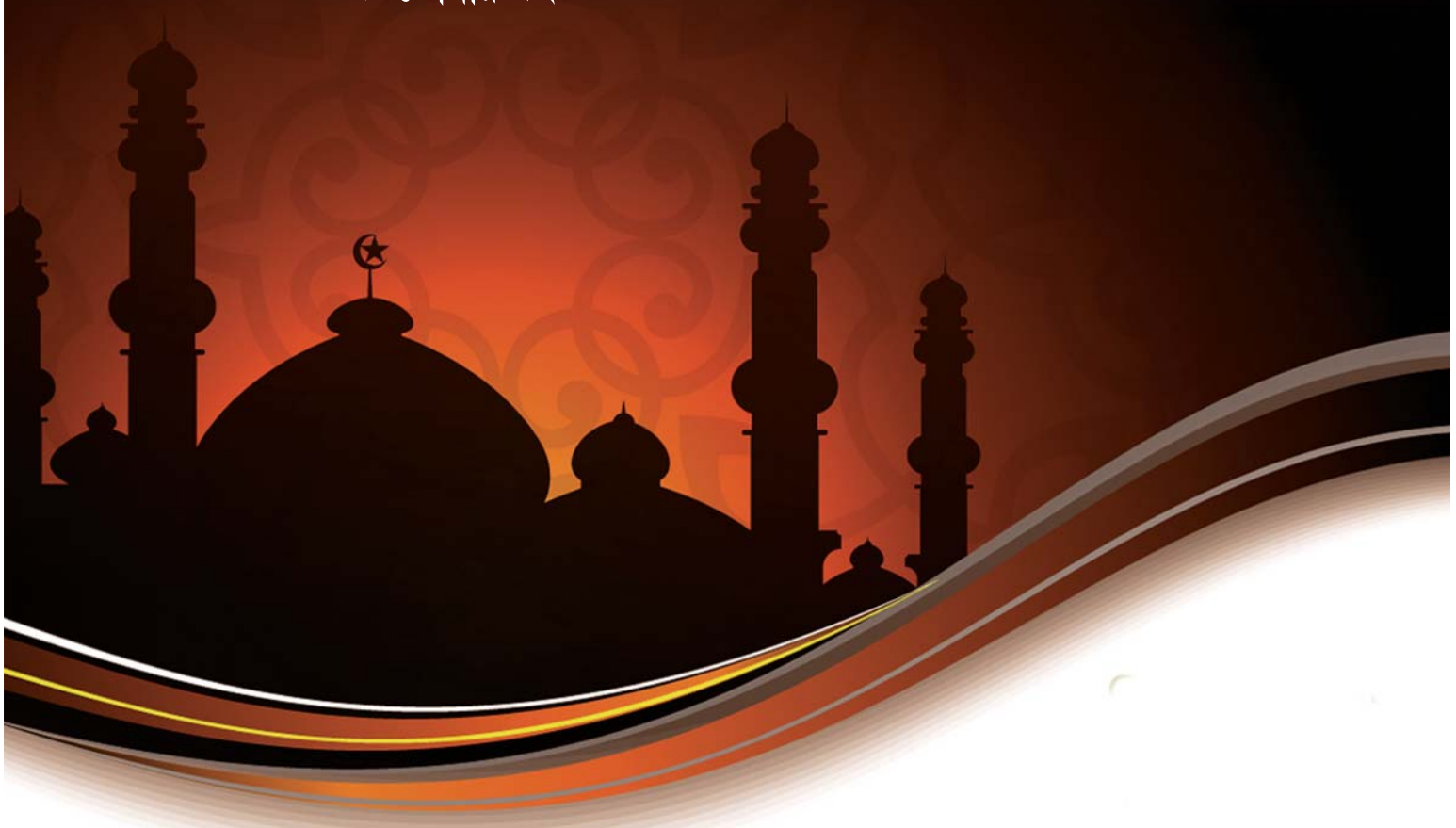

*Luxury Forever...*

| Bashundhara | Dhanmondi | Zigatola | Nurer Chala | Mirpur | Nordha |
|---|---|---|---|---|---|
| Size : 1285-1750 sft | Size : 1350 sft | Size : 1285 sft | Size : 1210-1215 sft | Size : 1275-1350 sft | Size : 1165-1350 sft |

**Land Wanted**

Hot Line : 01817-033388, 01819-296797, 01817-143100

উত্তম বাসস্থানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
কৌণিক প্রপার্টিজ লিঃ

Member | REHAB

# Kounik Properties Ltd

**Corporate Office :** Safwan Road, House # 193, Level # 6, Block # B, Bashundhara, Baridhara, Dhaka-1229, Bangladesh.

LOVE FOR ALL, HATRED FOR NONE

# Veronica tours & travels

Travel Agent & Tour Operator

Muhammad Belal Ahmad (Tushar)
CEO

VERONICA TOURS & TRAVELS
207/2, West Kafrul, Begum Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207
Phone: 88 02 9113176, Cell: 01733 004412, 01552 403395, E-mail: veronica@ithbd.com, tusharith@gmail.com

Our Sister Concern:
International Trading House (Garments Accessories Supplier), Hafsa Fashion Ltd. (Readymade Garments Manufacturer)
Awl Fashion (Buying Office), Color Clouds (Arts & Craft House), Bakers Bay (Bakery & Sweets)

# Amecon
Since 1983
www.amecon-bd.net

*Our Activities*
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing



MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

# AMECON
## NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

**Mobile: 01713001536, 01973001536**

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

| Jessore Office | Bogra Office | Chittagong Office |
|---|---|---|
| Palbari More, New Khairtola | Kanas Gari, Sherpur Road | 205, Baizid Bostami Road |
| Jessore. Tel : 67284 | Bogra. Tel : 73315 | Ctg. Tel : 682216 |

ameconniaz@yahoo.com

## সম্পাদকীয়

# রমযান সেই মাস যাতে নাযেল করা হয়েছে পবিত্র কুরআন

পবিত্র রমযান মাস আবার আমাদের মাঝে উপস্থিত। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি রোযা আমরা অতিবাহিত করেছি। এ মাসের কল্যাণ ও বরকত শেষ হওয়ার নয়। মহান এই মাসে আল্লাহ্ তা'লা মানবজাতির জন্য পথ-নির্দেশনা রূপে পবিত্র কুরআন নাযিল করেছেন। মোমেন-মুত্তাকি বান্দারা এই মাসে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি দান খয়রাত করে থাকেন। মহান খোদা তা'লার সমীপে আমাদের বিনীত যাচনা এই দান খয়রাত, ইবাদত বন্দেগী-সিয়াম সাধনাকে কবুল করে তিনি আমাদেরকে নাজাত দিবেন। আর পবিত্র এই রমযানে মহান খোদা তা'লা তার পরম সান্নিধ্যে আমাদের সিক্ত করবেন এটাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

এ পবিত্র মাসে ফরজ ইবাদতের পাশা-পাশি বেশি বেশি নফল ইবাদতে রত থেকে গভীর মনোনিবেশ সহকারে পবিত্র কুরআন পাঠের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য যাচনা করা আমাদের একান্ত দায়িত্ব। কারণ রমযান মাসের সাথে কুরআন করিমের সম্পর্ক ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। পবিত্র কুরআনে যেমনটি উল্লেখ রয়েছে- রমযান সেই মাস যাতে নাযেল করা হয়েছে কোরআন যা মানবজাতির জন্য হেদায়াতস্বরূপ এবং হেদায়াত ও ফুরকান (অর্থাৎ হক্ ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী) বিষয়ক সুস্পষ্ট প্রমাণাদি। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ এই মাসকে পায়, সে যেন এতে রোজা রাখে, কিন্তু যে কেউ রুগ্ন এবং সফরে থাকে তাহলে অন্য দিন গণনা পূর্ণ করতে হবে, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চান এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না, এবং যেন তোমরা গণনা পূর্ণ কর এবং আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন কর, এই জন্য যে, তিনি তোমাদেরকে হেদায়াতে দিয়েছেন এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর (সূরা বাকারা: আয়াত ১৮৭)।

আমাদের উচিত, পবিত্র এই রমযান মাসে কম পক্ষে একবার হলেও পবিত্র কুরআন খতম দেয়া। যে মসজিদগুলোতে খতম তারাবির ব্যবস্থা রয়েছে তাতে অংশ গ্রহণ করা। যার ফলে তারাবির নামাজও আদায় হলো আবার কুরআন খতমও হয়ে গেল। যারা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকেন তাদেরও উচিত, যে পবিত্র কুরআন পাঠের জন্য সময় বের করা। অফিসে কাজের ফাকে দুই এক রুকু অর্থসহ পড়ে নিতে পারেন। ছোট একটি কুরআন আপনার ব্যাগে রাখতে পারেন, যখনই সুযোগ হবে তখনই পাঠ করতে পারেন। এছাড়া ফজরের নামাযের পর বেশ কিছুক্ষণ পড়তে পারেন আবার রাতে ঘুমানোর পূর্বেও কিছুক্ষণ পড়তে পারেন। এভাবে যদি আপনি পড়তে থাকেন আর নিয়ত করে রাখেন যে আমি অবশ্যই এবার পবিত্র কুরআন খতম দিব তাহলে দেখবেন আল্লাহ্ তা'লা নিজেই আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

পবিত্র রমযান মাস মু'মিন-মুত্তকীদের জন্য সবচে বেশি ইবাদত বন্দেগির মাস। অন্যান্য মাসের চেয়ে এ মাসে আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে তাঁর রহমত ও নৈকট্য লাভের এক বিরাট সুযোগ করে দেন। হাদীসে উল্লেখ রয়েছে- হযরত রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন- যখন রমযান মাস আসে, তখন জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, আর শয়তানের পায়ে জিঞ্জির পরানো হয়' (বোখারি)। হযরত নবী করীম (সা.) আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি গভির বিশ্বাসে ও আন্তরিক একাগ্রতা নিয়ে উত্তম ফল লাভের বাসনায় রমযান মাসে রোযা রাখে, তার পুর্বেকার সর্বপ্রকার পাপ ক্ষমা করা হবে, (বুখারী, মুসলিম)।

মহান খোদা তা'লা আমাদের সকলকে পবিত্র এই রমযান মাসে সুস্থ্যতার সাথে নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় আত্মনিয়োগের তৌফিক দিন আর তাঁর রহমত, মাগফিরাত আর নাজাতের চাদরে আমাদের আচ্ছাদিত করে রাখুন, আমীন।

## সূচিপত্র

**১৫ জুলাই, ২০১৩**


| | |
|---|---|
| **কুরআন শরীফ** | ২ |
| **হাদীস শরীফ** | ৩ |
| **অমৃত বাণী** | ৪ |
| হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** (২৭ আগস্ট ২০১০) | ৫ |
| **রমযান মাসের ফযিলত ও বরকত**<br>মওলানা শরীফ আহমদ | ১১ |
| **রমযান আধ্যাত্মিক জগতের বসন্ত**<br>মওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান | ১৪ |
| **রোযা খোদা তা'লার জন্যই আর তিনিই এর প্রতিদান**<br>মৌলবী এনামুল হক রনী | ১৭ |
| **হযরত মুহাম্মদ (সা.) খাতামান্ নবীঈন কেন?**<br>খন্দকার আজমল হক | ১৯ |
| **শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)**<br>মাহমুদ আহমদ সুমন | ২১ |
| **ধর্ম কর্মে সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত মানুষের কথা**<br>ডা: শেখ হেলালউদ্দীন আহমদ | ২৪ |
| **রোযা মুত্তাকী হওয়ার ব্যবস্থাপত্র**<br>নাবিদ আহমদ লিমন | ২৫ |
| **খোদার নৈকট্য লাভ করাই রোযার প্রকৃত উদ্দেশ্য**<br>লাকী আহমদ | ২৬ |
| **নামায এবং দোয়া**<br>অনুবাদ: আসিফ আহমদ | ২৭ |
| **পবিত্র রমযান মাসের তরবিয়তী কার্যক্রম** | ২৯ |
| **পত্র-পত্রিকার পাতা থেকে-** | ৩০ |
| **সংবাদ** | ৩৪ |
| বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী | ৪০ |

# কুরআন শরীফ

## সূরা বাকারা-২

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَ الْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۸۶﴾

১৮৬। রমযান[২০৭ক] সেই মাস যাতে (বা যার সম্পর্কে) কুরআন অবতীর্ণ[২০৭খ] করা হয়েছে। ( এ কুরআন) মানবজাতির জন্য[২০৮] এক মহান হেদায়াতরূপে এবং হেদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে (অবতীর্ণ করা হয়েছে) অতএব তোমাদের মাঝে যে এ মাসকে পাবে সে যেন এতে রোযা রাখে। কিন্তু যে অসুস্থ অথবা সফরে থাকে তাকে অন্যান্য দিনে[২০৯] (রোযার এ) সংখ্যাপূর্ণ করতে হবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চান এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না। আর তিনি চান তোমরা যেন (রোযার নির্ধারিত) সংখ্যা পূর্ণ কর। আর তিনি যে তোমাদের হেদায়াত দান করেছেন সেজন্য তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর, যেন তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

২০৭-ক। 'রমযান' চান্দ্রমাসগুলোর নবম মাস। শব্দটি 'রামাযা' ধাতু থেকে উৎপন্ন। 'রামাযাস্ সায়িমু' অর্থ রোযা রাখার দরুন রোযাদারের ভিতরটা তৃষ্ণায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে (লেইন)। মাসটির নামকরণ এ কারণে হয়েছে : (১) রোযার কারণে এ মাসটিতে মানুষের তৃষ্ণা ও জ্বালা বৃদ্ধি পায়, (২) এ মাসের ইবাদত-বন্দেগী মানুষের পাপকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দেয়, (আসাকির ও মারদাওয়াই), (৩) এ মাসে মানুষের তপস্যা ও সাধনা তার মনে স্রষ্টার প্রতি ভালবাসার উত্তাপ সৃষ্টি করে এবং মানবের প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক করে। 'রমযান' নামটি ইসলামের অবদান। এ মাসটির পূর্বনাম ছিল 'নাতিক' (কাসীর)।

২০৭-খ। রমযান মাসের ২৪ তারিখে হযরত রাসূল করীম (সা.) প্রথম আল্লাহ্‌র বাণী পেয়েছিলেন (জরীর)। এ রমযান মাসেই জিবরাঈল প্রতি বছরে পূর্বে অবতীর্ণ হওয়া সমস্ত বাণী রাসূল করীম (সা.) এর কাছে পুনরাবৃত্তি করতেন। এ ব্যবস্থা মহানবী (সা.) এর জীবনের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তাঁর জীবনের শেষ বছরের রমযান মাসে জিবরাঈল পূর্ণ কুরআনকে মহানবী (সা.) এর কাছে দু'বার পাঠ করে শুনান (বুখারী)। এ হিসাবে বলা যেতে পারে, সমগ্র কুরআনই রমযান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে।

২০৮। 'আল কুরআন' শব্দটি 'কারায়া' হতে উৎপন্ন। 'কারায়া' অর্থ সে পাঠ করেছিল, সে বাণী পৌঁছিয়েছিল, সে সংগ্রহ করেছিল। 'কুরআন' অর্থ : (১) পঠনের উপযোগী পুস্তক, যা বার বার পাঠ করা যায়। কুরআন বিশ্বের সর্বাধিক পঠিত পুস্তক (এনসাইক্লো-বৃট.), (২) একটি পুস্তক কিংবা বাণী যা পৃথিবীর সর্বত্র নিয়ে যাওয়া ও পৌঁছানো প্রয়োজন। কুরআনই একমাত্র পুস্তক যার বাণী সারা বিশ্বের জন্য সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত। কেননা যেখানে অন্যান্য অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থাদি স্থান, কাল ও পাত্রে সীমাবদ্ধ, সেখানে কুরআনই একমাত্র অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থ যা সকল দেশ, সকল জাতি ও সকল সময়ের জন্য এসেছে (৩৪ : ২৯), (৩) এমন গ্রন্থ যা সকল সত্যকে ধারণ করে। কুরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যা যাবতীয় জ্ঞানের এক অফুরন্ত ভান্ডার। এতে অন্যান্য অবতীর্ণ গ্রন্থাবলীর শাশ্বত সত্যগুলো তো স্থান লাভ করেছেই, উপরন্তু সকল অবস্থায় সকল মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক নতুন নতুন শিক্ষা ও সত্য এতে সংযোজিত হয়ে এটা সর্বকালের জন্য পূর্ণতম গ্রন্থে পরিণত হয়েছে (৯৮ : ৪; ১৮ : ৫০)।

২০৯। এ বাক্যটি অপ্রয়োজনীয় পুনরুক্তি নয়। কেননা পূর্ববর্তী আয়াতে মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতির ক্ষেত্র গঠনের জন্য এ বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে যাতে রোযা রাখার নির্দেশ তারা সহজে গ্রহণ করতে পারে। এ আয়াতে সেই নির্দেশেরই বাস্তবায়নকে উপলক্ষ্য করে এ বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে বাক্যটি নির্দেশেরই অঙ্গ-বিশেষ। 'অসুস্থতা' 'সফর' শব্দগুলোকে সংজ্ঞায়িত না করে কুরআন মানুষের সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনা ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে শব্দগুলোর অর্থ করার ভার ছেড়ে দিয়ে বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা দেখিয়েছে।

# হাদীস শরীফ

## রমযানের রোযা তাক্‌ওয়া সৃষ্টি করে

*হাদীস ঃ*

হযরত আবু আয়্যুব আনসারী (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখে এবং পরবর্তীতে (ঈদের দিন বাদ দিয়ে) শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযা রাখে সেক্ষেত্রে সে যেন গোটা বছরই রোযা রাখলো (মুসলিম)।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমান ও পূর্ণাঙ্গীন শর্তাবলীসহকারে রমযানের রোযা রাখে তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়।

*ব্যাখ্যা ঃ*

রমযান একটি পবিত্র মাস। এ মাসের ইবাদত খোদার নিকট সবচেয়ে প্রিয়। কারণ নামায-রোযার সমন্বয় মানুষের মাঝে খোদার নৈকট্য লাভের এক আলোড়ন সৃষ্টি করে দেয়। তা এভাবে যে, নামায আত্মাকে পবিত্র করে এবং রোযা হৃদয়কে আলোকিত করে। ফলশ্রুতিতে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি রোযা দ্বারা আধ্যাত্মিকতার এক নতুন রাস্তায় পরিচালিত হয়ে খোদার সন্তুষ্টির ছায়াতলে চলে আসে। কুরআন বলে, রোযা তোমাদের মাঝে তাক্‌ওয়া অর্থাৎ খোদা-ভীতি সৃষ্টি করবে।

এই তাক্‌ওয়া কিভাবে সৃষ্টি হবে? বস্তুতঃ রোযা এমন ইবাদত যা মানুষের প্রতিটি ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ করে। যদি ইন্দ্রিয়কে নিয়ন্ত্রণ না রেখে কেউ রোযা রাখে তবে তা রোযা নয় বরং অন্য কিছু। খোদা-ভীতির সৃষ্টি এভাবেই হয় যে, মানুষ খোদার সন্তুষ্টির জন্য নিজের মন-মেজাজ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে খোদার ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয়। ফলে ধীরে ধীরে তার অবাধ্য আত্মা নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। ঐ সকল কর্ম হতে সে দূরে সরে পরে যা খোদার অসন্তুষ্টির কারণ হয়।

হযরত রসূল করীম (সা.) শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযার কথা উল্লেখ করে এর গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন যে, রমযানের ৩০ টি ও শাওয়ালের ৬টি মোট ৩৬ টি রোযা যে রাখবে সে যেন সারাটা বছর রোযা রাখার সওয়াব পেল। এক হাদীসে আছে, এক রোযার দশটি সওয়াব। এভাবে ৩৬X ১০ মোট ৩৬০ হয় অর্থাৎ ৩৬০ দিন রোযা। অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যদি কেউ পূর্ণ শর্তাবলীর সাথে রোযা পালন করে তবে তার পূর্বেকার সকল পাপ মাফ করে দেয়া হবে। এর অর্থ হলো, রমযান তাক্‌ওয়া সৃষ্টি করে থাকে। যদি কেউ রোযা পালনের মাধ্যমে এ তাক্‌ওয়া নিজের মাঝে সৃষ্টি করে নেয় ও তওবাতুন নাসূহ্ (অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গীন তওবা দ্বারা নিজের সংশোধন করে নেয় আর কখনও পাপের দিকে ফিরে না তাকায়) করে, তাহলে এমন ব্যক্তির প্রতি খোদা দয়া পরবশ হয়ে তার গুনাহ্ মাফ করে দেন। রোযার মাস সংযমের মাস, সাধনার মাস।

আসুন, এই রমযানে আমরা চেষ্টা করি, সাধনা করি, যেন আমাদের অবাধ্য আত্মা অর্থাৎ 'নফসে আম্মারা' প্রশান্তি প্রাপ্ত আত্মাতে অর্থাৎ 'নফসে মুতমাইন্না'তে পরিণত হয়। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে পবিত্র রমযান মাসে এ সাধনা করার তৌফিক দিন, আমীন।

*আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ*

মুরব্বী সিলসিলাহ্

# অমৃতবাণী

## অহংকারের লেশ মাত্রও অবশিষ্ট থাকলে হৃদয়ের সমস্ত জ্যোতি নষ্ট হয়ে যায়

**হযরত ইমাম মাহদী (আ.)**

তোমরা আল্লাহ্‌র অভিসম্পাতকে ভয় কর, যা আকাশ হতে অবতীর্ণ হয় এবং যার উপর তা নিপতিত হয়, তার ইহকাল ও পরকালকে সমূলে বিনষ্ট করে। তুমি কপটতা দ্বারা নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না, কারণ যিনি তোমাদের খোদা, তিনি মানব হৃদয়ের অন্ত:স্থল পর্যন্ত দেখে থাকনে। তোমরা কি তাঁকে প্রতারণা করতে পার? সুতরাং তোমরা পরিষ্কার, সরল, পবিত্র এবং নির্মল হয়ে যাও। যদি তোমাদের মধ্যে অহংকারের লেশ মাত্রও অবশিষ্ট থাকে, তবে তা তোমাদের হৃদয়ের সমস্ত জ্যোতিকে নষ্ট করে দিবে। যদি তোমাদের হৃদয়ের কোন অংশে অহঙ্কার, কপটতা, আত্মশ্লাঘা বা আলস্য বর্তমান থাকে, তবে তোমরা আদৌ তাঁর গ্রহণযোগ্য হবে না।

দেখ, তোমরা মাত্র কয়েকটি কথা শিখে যেন আত্মপ্রতারণা না কর যে, তোমরা তোমাদের কর্তব্য সাধন করেছ। আল্লাহ্ তাআলা চাহেন যেন তোমাদের জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে। তিনি তোমাদের নিকট হতে এক মৃত্যু চাহেন। এরপর তিনি তোমাদেরকে এক নতুন জীবন দান করবেন। যত শীঘ্র সম্ভব তোমাদের পরস্পরের বিবাদ মীমাংসা করে ফেল এবং নিজ ভ্রাতাকে ক্ষমা কর। কারণ, যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতার সাথে বিবাদ মীমাংসা করতে প্রস্তুত নয়, সে নিশ্চয় অসাধু। সে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে, সুতরাং সে সম্বন্ধচ্যুত হয়ে যাবে। তোমরা নিজ নিজ রিপুর বশবর্তীতা সর্বতোভাবে পরিহার কর এবং পারস্পরিক মনোমালিন্য পরিত্যাগ কর এবং সত্যবাদী হয়েও মিথ্যাবাদীর ন্যায় বিনয়াবনত হও, যেন তোমরা ক্ষমার অধিকারী হতে পার। তোমরা রিপুর স্থূলতা বর্জন কর। কারণ, যে দ্বার দিয়ে তোমাদেরকে আহ্বান করা হয়েছে, সে দ্বার দিয়ে কোন স্থূলরিপু ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারবে না।

কত হতভাগ্য সে ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌র মুখনি:সৃত বাণী যা আমার দ্বারা প্রচারিত হয়েছে, মানতে প্রস্তুত নয়! তোমরা যদি ইচ্ছা কর যে, আকাশে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, তবে তোমরা পরস্পর সহোদর ভাইয়ের মত হয়ে যাও। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি, যে হঠকারিতা করে এবং নিজের ভ্রাতার অপরাধ ক্ষমা করতে প্রস্তুত নয়, তেমন ব্যক্তির সাথে আমার কোন সংস্রব নেই। খোদা তাআলার অভিশাপ হতে সর্বদা অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত থেকো। কারণ তিনি অতি পবিত্র এবং আত্মমর্যাদাভিমানী। পাপাচারী কখনও খোদার নৈকট্য লাভ করতে পারে না। অহংকারী কখনও খোদার নৈকট্য লাভ করতে পারে না। যারা কুকুর, পিপীলিকা বা শকুনের মত সংসারাসক্ত এবং সংসার-সম্ভোগে নিমগ্ন তারা কখনও তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারে না। প্রত্যেক অপবিত্র চক্ষু তা থেকে দূরে।

প্রত্যেক পাপাসক্ত মন তাঁর সম্বন্ধে অজ্ঞ। যে ব্যক্তি তাঁর জন্য অগ্নিতে নিপতিত, তাকে অগ্নি হতে মুক্তি দেয়া হবে। যে ব্যক্তি তাঁর জন্য কাঁদে, সে অবশ্যই হাসিবে। যে ব্যক্তি তাঁর উদ্দেশ্যে সংসারের মায়া মোহকে বর্জন করে, সে নিশ্চয় তাঁকে লাভ করবে। তোমরা আন্তরিকতাপূর্ণ সরলতা এবং উৎসাহের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব লাভ করতে অগ্রসর হও, তাহলে তিনিও তোমাদের বন্ধু হবেন। তোমরা নিজ অধীন ব্যক্তিদের প্রতি, তোমাদের স্ত্রী-পরিজন এবং গরীব ভাইদের প্রতি দয়া কর যেন আকাশে তিনিও তোমাদের উপর দয়া করেন। তোমরা যথার্থই তাঁর হয়ে যাও যেন তিনিও তোমাদের হয়ে যান। জগৎ বহু বিপদের স্থান। অতএব, তোমরা একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহর দিকে ধাবমান হও যেন তিনি এই বিপদরাশি হতে তোমাদেরকে দূরে রাখেন। জগতে কোন বিপদ দেখা দেয় না, যে পর্যন্ত আকাশে তদ্বিষয়ে সিদ্ধান্ত না হয় এবং কোন বিপদ জগৎ হতে দূর হয় না, যে পর্যন্ত আকাশ হতে তাঁর দয়া বর্ষণ না হয়। সুতরাং তোমাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় এটাই যে, তোমরা শাখাকে অবলম্বন না করে মূলকে ধর। তোমাদের জন্য ঔষধ এবং উপকরণের ব্যবহার নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু এদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। কারণ পরিশেষে অবশ্য তা-ই ঘটবে, যা তিনি ইচ্ছা করেন। যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরের শক্তি রাখে তবে তদ্রুপ নির্ভরতার স্থান সর্বোচ্চ, সন্দেহ নেই।

(কিশ্‌তিয়ে নূহ্ পুস্তকের ২৩-২৫ পৃষ্ঠা)

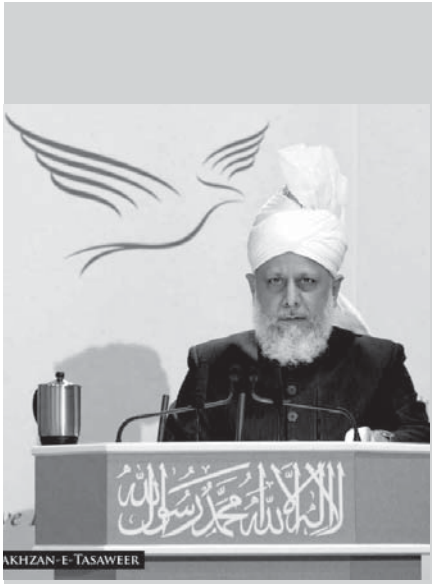


# জুমুআর খুতবা

**সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে ২৭ আগষ্ট, ২০১০-এ প্রদত্ত জুমুআর খুতবা**

**[সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ থেকে খুতবা না পাওয়ায় পূর্ব প্রকাশিত খুতবা পূণর্মুদ্রিত করতে হচ্ছে। এজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।]**

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

**রমযানে বান্দা যখন আধ্যাত্মিক অবস্থা উন্নতির চেষ্টা করবে তখন খোদা তা'লা তাকে লায়লাতুল ক্বদরের দৃশ্য দেখিয়ে নিজের নিকটবর্তী করতে থাকবেন।**

إِنَّا أَنْزَلْنٰهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَا أَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝
لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوحُ
فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلٰمٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

(সূরা আল্ ক্বদর)

এখনই আমি সূরা আল্ ক্বদর পাঠ করলাম আর এর অনুবাদ হল, নিশ্চয় একে আমরা কদরের রাতে অবতীর্ন করেছি। আর কিসে তোমাকে বুঝাবে, 'ক্বদরের রাত' কী? ক্বদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এতে ফিরিশতারা এবং পবিত্রাত্মা তাদের প্রভূ প্রতিপালকের আদেশে অধিক হারে অবতীর্ণ হয়। সব বিষয়ে এক অনাবিল শান্তি এ অবস্থা ভোর পর্যন্ত বিরাজ করে।

আল্লাহ্ তা'লা চাইলে কয়েক দিনের মধ্যেই আমরা রমযানের শেষ দশকে পদার্পন করব। যে বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে, [রাসূলে পাক (সা.) বলেছেন] এতে এমন একটি রাত আসে যাকে 'লায়লাতুল ক্বদর' বলা হয়। অর্থাৎ এমন এক রাত যাতে তাঁর নিষ্ঠাবান বান্দাদের উপর আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ দৃষ্টি পড়ে। যখন তাদের মাঝে এক বিশেষ আধ্যাত্মিক অবস্থা বিরাজ করে এবং আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ ফজল এবং নৈকট্য প্রত্যক্ষ করে। এজন্য রমযানের শেষ দশককে মুসলমানরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

সাধারণত এমন অনেকেই আছে যারা নামায, তারাবি এবং অন্যান্য পূণ্যকর্মের প্রতি রমযানের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে মনোযোগী হয় না তারাও তুলনামুলক ভাবে শেষ দশকে এসে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে চেষ্টা করে। জামা'তের মাঝেও এমন অনেকেই রয়েছেন যাদের এদিকে ঝোক রয়েছে। আর এ দশকে তাহাজ্জুদ এবং নফল নামায আদায়ের প্রতিও তারা বিশেষ মনোযোগী হন। যেভাবে আমি বলেছি, এমনটি করার কারণ বিভিন্ন হাদিস থেকে এটা প্রমানিত ও সুস্পষ্ট হয় যে, এ দশকে এমন একটি রাত আছে যাকে 'লায়লাতুল ক্বদর' বলা হয়। আর এটি এমন রাত যা খুবই গুরুত্ব বহন করে।

কিন্তু আমরা যদি কেবল শেষ দশকের জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা করি আর বাকি সারা বছর এমন কোন প্রচেষ্টা না থাকে তবে এ বিষয়টি কি একজন মানুষকে প্রকৃত মু'মিন ও বান্দা বানাতে সক্ষম হবে? দেখো! অন্য একস্থানে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, জিন ও মানুষকে সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হল তাঁর ইবাদাত করা। সুতরাং এক রাত ইবাদাত কর বা এক রাতের সন্ধানে দশ দিন ইবাদত করে নাও তবে তোমাদের সারা জীবনের ইবাদতই সম্পন্ন হয়ে যাবে, এমন কথার ওপর আমল করলে তা এক মানুষকে আল্লাহ্ তা'লার আদেশ 'তোমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য ইবাদত করা, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিনত থাকা'- এ থেকে দূরে সরিয়ে নিবে।

একটি বর্ণনায় এসেছে, যির্‌রা বিন হুবায়েস বলেন আমি উবাই বিন কা'ব (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার ভাই ইবনে মাসউদ বলেন, যে ব্যক্তি সারা বছর ইবাদত করবে সে-ই 'লায়লাতুল ক্বদর' পাবে? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তাঁর প্রতি দয়া করুন, তাঁর একথা বলার উদ্দেশ্য হল, মানুষ যেন কেবল একটি রাতের ওপরই নির্ভর না করে। অন্যথায় তিনি খুব ভালভাবেই জানেন, সে রাত রমযান মাসে আসে এবং রমযানের শেষ দশকে আসে। (মুসলিম কিতাবুস্ সিয়াম, হাদীস নম্বর, ২৭৭৭) সাহাবীরা এ বিষয়ের

গভীর তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন যে, কেবল শেষ দশকের ইবাদতই 'লায়লাতুল ক্বদর' দেখার কারণ হয় না বরং মানুষ যখন রেখে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের প্রতি মনোযোগী হয় তখন খোদা তা'লা চাইলে নিজ বান্দাদের মনস্তুষ্টির লক্ষ্যে তাদেরকে স্বীয় ফযলে ভূষিত করে নিজ নৈকট্যের বহির্প্রকাশের উদ্দেশ্যে সেই অবস্থা সৃষ্টি করে দেন যাতে তাঁর ইবাদতকারী বান্দা এ বিশেষ রাত লাভ করতে সক্ষম হয় আর এক অদ্ভূত আধ্যাত্মিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে আল্লাহ্ তা'লার বান্দায় পরিণত হয়ে যায়। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা একজন মু'মিনকে তার ঈমান ও ইবাদতের অঙ্গিকার পূর্ণ করার জন্য একটি বিশেষ রাত রেখেছেন যাতে প্রতি মুহূর্তে একজন মু'মিনের কর্মকান্ডে উন্নতি পরিলক্ষিত হয় এবং হওয়া উচিতও এবং রমযানের রোযা, কুরআন করিমের তিলাওয়াত ও তা বুঝা আর এ জন্য ইবাদতের মান উন্নত করার চেষ্টা করা যেন রমযানে আমার ইবাদত বন্দেগীর মান আরো উন্নত হয়।

মু'মিন যখন এক বিশেষ প্রচেষ্টা ও আগ্রহের সাথে উচ্চ মান অর্জন করার লক্ষ্যে কোমর বেঁধে লেগে যায় তখন নিজ বান্দার প্রতি পরম দয়াশীল ও নিজ প্রতিশ্রুতিকে পূর্ণকারী আল্লাহ্ তা'লা যখন দেখেন বান্দা তার সব যোগ্যতা অনুযায়ী এবং তাঁরই আদেশের উপর আমল করে তাঁর এ বাক্য -

أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

অর্থাৎ 'প্রার্থনাকারী যখন আমার কাছে দোয়া করে তখন আমি তার ডাকে সাড়া দেই'- সামনে রেখে প্রার্থনা করে তখন আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি শুধু তার দোয়া-ই শুনি তা নয় বরং রমযানের শেষ দশকে আমার বান্দাদের জন্য এক মহিমান্বিত রাত লাভের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছি– তাও দান করি। আকাশ থেকে নেমে বান্দার নিকটবর্তী হয়ে যাই এবং বলি, আজ রাতে তোমরা যাচনা কর আমি তোমাদের দান করব। সুতরাং বান্দা যখন নিজ অঙ্গীকার পূর্ণ করে তখন আল্লাহ্ তা'লাও দোয়া কবুলিয়্যতের বরং আধ্যাত্মিক মর্যাদায় উন্নীত করার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন। নিশ্চয়ই আমাদের খোদা অঙ্গীকার পূর্ণকারী খোদা। কোথাও কোন ঘাটতি থাকলে তা আছে আমাদের কর্ম ও প্রচেষ্টায়।

আল্লাহ্ তা'লা তো প্রতি বছরই রমযান মাস দিয়ে থাকেন, সে মাসে এ দশদিন রাখেন যার মাঝে একটি রাত 'লায়লাতুল ক্বদর' যা বান্দাকে খোদার নৈকট্য দেয়ার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পর্যায়। অতএব ভেবে দেখুন! বান্দাকে এ রাতের প্রস্তুতির জন্য কেমন চেষ্টা করা প্রয়োজন? যিনি এই একটি রাত পাবেন তিনি খোদা তা'লার দৃষ্টিতে যে মর্যাদা লাভ করেন তা তার সারা জীবনের ইবাদতের সমতুল্য। অর্থাৎ এই একটি রাত তার চেহারা বদলে দেয়। সে আর সে থাকে না যা সে পূর্বে ছিল। আর এমন পরিবর্তনই হওয়া উচিত। অন্যথায় এ রাতের প্রাপ্তি আদায় হবে না। এক মু'মিনের বৈশিষ্ট্যই হল, তার আধ্যাত্মিক অবস্থা সর্বদাই উন্নতির দিকে ধাবিত হয়।

কেউ যদি মনে করে, আমি 'লায়লাতুল ক্বদর' পেয়েছি যে রাতের ইবাদত হাজার মাসের ইবাদতের চেয়েও উত্তম, কাজেই এখন আমার আর ইবাদাত করার প্রয়োজন নেই, তবে সে মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসার লাভের স্পৃহা এক মু'মিনকে পূর্বাপেক্ষা আল্লাহ্ তা'লার অধিক ইবাদাতকারী এবং তাঁর আদেশ পালনকারী বানায়। অতএব, এ অবস্থা সৃষ্টি হলে আল্লাহ্ তা'লার কল্যানের ধারা বইতে শুরু করে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি তোমাদের দোয়া শুনব। তোমরা আমার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে চেষ্টা করেছ, সামনে পা বাড়িয়েছ, কঠোর প্রচেষ্টা করেছ, তোমরা তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করেছ এবং এর রক্ষণাবেক্ষণ করেছ। এখন তোমরা এ আমল জারি রাখলে আমিও তোমাদের কল্যাণমন্ডিত করতে থাকব। অর্থাৎ রমযানে বান্দা যখন আধ্যাত্মিক অবস্থা উন্নতির চেষ্টা করবে তখন খোদা তা'লা তাকে লায়লাতুল ক্বদরের দৃশ্য দেখিয়ে নিজের নিকটবর্তী করতে থাকবেন। একজন মু'মিনের নিজের সত্তার জন্য লায়লাতুল ক্বদর সম্বন্ধে সঠিক ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে একস্থানে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, "লায়লাতুল ক্বদর মানুষের জন্য সর্বোচ্চ পবিত্র করণের সময়।" (মালফুযাত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৩৬)

অর্থাৎ সে যখন পুরোপুরি পবিত্র হয় আর (বিশ্বস্ততার সাথে) আল্লাহ্ তা'লার আদেশসমূহের মান্যকারী হতে প্রয়াসী হয়। এহেন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা-ই লায়লাতুল ক্বদরের কল্যাণে কল্যাণমন্ডিত করে তুলে। আর রমযানের মাস এরূপ আধ্যাত্মিক বিপব সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এসে থাকে। আমরা যদি এর মর্যাদা দেই তবে লায়লাতুল ক্বদর পাব এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারীতে পরিণত হব।

যেভাবে আমি একটি হাদিস বর্ননা করেছি, রমযানের শেষ দশকে 'লায়লাতুল ক্বদর' অন্বেষণ কর।

এ বিষয়ে আমি আরো কয়েকটি হাদিস বর্ণনা করছি যাতে এই শেষ দশকের গুরুত্ব এবং নবী করীম (সা.)-এর বিশেষ গুরুত্বারোপ সম্বন্ধে জানা যায় যে, তিনি (সা.) কতটা গুরুত্ব দিতেন।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, রমযানের শেষ দশক শুরু হলে নবী করীম (সা.) কোমর বেঁধে নামতেন এবং সারা রাত জেগে থাকতেন। (বুখারী, হাদীস নং-২০২৪)

অর্থাৎ ঘুম খুব কম হত, ঘুমাতেন বটে তবে কম এবং নিজ গৃহের সবাইকে জাগাতেন। অতএব, এ হাদিস থেকে এটি স্পষ্ট যে, শেষ দশকে মহানবী (সা.) স্বয়ং পূর্বের তুলনায় কয়েক গুণ বেশি ইবাদত করতেন। যদিও রাসূলে করীম (সা.)-এর সাধারণ দিনগুলোর ইবাদতের ব্যাপ্তি ও সৌন্দর্য্য সম্পর্কে তো আমরা ধারণা-ও করতে পারি না। (মুসনদ আহমদ বিন হাম্বল, হাদিস নং-২৪৯৫০)

হযরত আয়েশা (রা.) একবার এ উত্তরও দিয়েছিলেন। কাজেই এ দশকে কী অবস্থা হতো! এটা তো কল্পনাও করা যায় না। আর আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে ফযল ও কল্যাণের যে বারিধারা হতো বা এ দশকে আল্লাহ্ তা'লার ফযলের যে বারিধারা বর্ষিত হয় সে বিষয়ে নবী করীম (সা.) সবচেয়ে ভাল জানতেন। অতএব, তিনি (সা.) এটা কিভাবে সহ্য করতে পারবেন যে, তাঁর পরিবারের সদস্যরা এ থেকে বঞ্চিত থাকবে? তাই তিনি (আ.) তাদেরকেও জাগিয়ে দিতেন ফলে যে আধ্যাত্মিক পরিবেশ ও অবস্থার সৃষ্টি হতো এর অনুমান করাও অ-ভাবনীয়। সুতরাং নবী করীম (সা.) আমাদের জন্য এ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও সৌভাগ্য দিন, আমরাও যেন আমাদের এবং আমাদের পরিবারের মাঝে এ অবস্থা সৃষ্টি করার চেষ্টা করি।

এ অবস্থা যখন আমরা নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করব তখন এটি আমাদের ক্ষমা লাভেরও কারণ হবে। আর আমরা প্রকৃত মু'মিন বলে পরিগনিত হব। এ বিষয়ের আরও কয়েকটি হাদিস আমি উপস্থাপন করছি-

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) মহানবী (সা.) থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের তাড়নায় আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে রমযান মাসে রোযা রাখে তার পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি লায়লাতুল ক্বদরে ঈমানী উদ্দীপনায় আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে রাতে উঠবে তার পূর্বে কৃত সব পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (বুখারী, হাদিস নং-২০১৪)

সুতরাং রমযানের রোযাও ঈমানে দৃঢ়তা এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের সাথে শর্তযুক্ত। অন্যথায় ক্ষুধার্ত থাকা আল্লাহ্‌র কাছে কোন মূল্য রাখে না। আর লায়লাতুল ক্বদরও খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভের সাথে শর্তযুক্ত। নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। কেবল জাগতিক স্বার্থে যেমন, লায়লাতুল ক্বদর পেলে আমি দোয়া করব, আমার যেন জাগতিক স্বার্থ সিদ্ধি হয়, এমনটি নয়। নেকী লাভের চেষ্টা করা উচিত। বরং দোয়ার মাঝে সর্বাগ্রে যেন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি থাকে। এর প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে মহানবী (সা.) এভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন,

এটি হুরাইসের ছেলে উকবা বর্ণিত হাদিস, তিনি বলেন. আমি আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা.)-র কাছে শুনেছি তিনি বলেছেন, নবী করীম (সা.) বলেন, তোমরা তা শেষ দশকে অন্বেষণ কর। (তাঁর উদ্দেশ্য ছিল লায়লাতুল ক্বদর)। তোমাদের কেউ যদি দূর্বল অথবা অপারগ হয় তবে সে যেন কোন ভাবেই শেষ সাত রাতে অপারগ না হয়। (সহীহ্ মুসলিম, হাদিস নং-২৭৬৫)

অতএব, দেখুন! কতটা গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, কোন কারণে রমযান থেকে কল্যাণমন্ডিত হতে না পারলেও তুমি যদি প্রকৃত মু'মিন হবার আশা রাখ তবে এ দশক অথবা সাত দিনে সকল দূর্বলতা দূরে ছুঁড়ে ফেল এবং নিজের রাতগুলোকে খোদা তা'লার ইবাদতে এভাবে অতিবাহিত কর যাকে প্রকৃত ইবাদত বলা হয়, যার দৃষ্টান্ত মহানবী (সা.) আমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন। এ প্রচেষ্টাই তোমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ হবে এবং আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য এনে দিবে।

অন্য একটি হাদীসে এসেছে, সালেম বিন আব্দুল্লাহ্ বিন উমর বলেন, তার পিতা সাহাবী ছিলেন (রা.) বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে লায়লাতুল ক্বদর সম্বন্ধে বলতে শুনেছি, তোমাদের কতককে তা (শেষ দশকের) প্রথম সাত রাতে দেখানো হয়েছে এবং তোমাদের কতককে শেষ সাত রাতে দেখানো হয়েছে। (সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং-২৭৬৪)

সুতরাং এ হাদিসের মাধ্যমে প্রথম হাদীসটি সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, কেবল শেষ সাত রাত নয় বরং শেষ দশ রাত, কেননা এর জন্য নির্দিষ্ট কোন তারিখ নেই। হতে পারে কিছু সাহাবা (শেষ দশকের) প্রথম সাত রাতে দেখেছেন আর কিছু সাহাবা শেষ সাত রমযানে দেখেছেন। কিন্তু হাদিসে এও পাওয়া যায় যে, বেজোড় রাতে অন্বেষণ কর। (সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং-২৭৬৩)

যাইহোক, যিনি-ই দেখে থাকুক না কেন এতে আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ ফযল রয়েছে। যেভাবে আমি পূর্বে উলেখ করেছি, লায়লাতুল ক্বদর অতিবাহিত করার পর এর মূল্যায়ন করাও আবশ্যক। আর তা হবে এভাবে যে, মানুষের মাঝে যেন এমন পরিবর্তন সাধিত হয় যা সর্বদাই আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে নিয়ে যায় এবং বৃদ্ধি পায়। যে সব কথা আমি বললাম, এটি লায়লাতুল ক্বদরের একটি দিক, হাদীস অনুযায়ী যাতে রমযানের শেষ দশকের বেজোড় দিনগুলোতে খোদা তা'লার বিশেষ ফযল বর্ষণের এক রাতের কথা উলেখ রয়েছে। এ বিষয়ে কুরআন করীম বলে, যেভাবে আমি সূরা আল ক্বদর তেলাওয়াত করেছি, "হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম"। আর হাজার মাসে ৮৩ বছরেরও বেশি প্রায়। অর্থাৎ এ রাত পাওয়া গেলে মানুষের সমস্ত জীবনের দোয়াসমূহ (যা খোদা তা'লার দৃষ্টিতে এক মু'মিনের জন্য কল্যাণকর) তা কবুল হয়ে যায়। মানুষ অনেক ধরনের দোয়া করে থাকে কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে সবগুলো উত্তম মনে হয় না।

মু'মিন যখন একনিষ্ঠ চিত্তে আল্লাহ্‌র প্রতি বিনয়াবনত হয়ে দোয়া করেন যা আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে উত্তম বিবেচিত হয়, তখন আল্লাহ্ তা'লা তার মঙ্গলের বিষয় দৃষ্টিতে রাখে তার জন্য সে দোয়া কবুল করেন। অথবা মু'মিন সে মর্যাদা লাভ করে যা তার আধ্যাত্মিক পদমর্যাদাকে উন্নীত করে। ফিরিশতার অবতীর্ণ হওয়া মু'মিনের সাথে আল্লাহ্‌র সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিপব সাধনের কারণ হয়ে থাকে। আর এক রাতের ইবাদত সারাজীবনের ইবাদাতের বরাবর হয়ে যায়। কেননা সে তার জন্মের উদ্দেশ্য লাভ করেছে। যেভাবে আমি বলেছি, একবার যখন পেয়ে যায় তখন একজন মু'মিন তা পেতে থাকার উদ্দেশ্যে সন্ধান ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়।

সুতরাং এ রাতটি এক মু'মিনের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্ব রাখে। কিন্তু এটি আরও বিস্তৃত অর্থ বহন করে যা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন। যেভাবে আমি বলেছি, এ সূরায় স্পষ্ট লেখা রয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ অর্থাৎ আমরা তাকে ক্বদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি। কোন্ জিনিসকে ক্বদরের রাতে অবতীর্ণ করেছেন? তা হল এই পরিপূর্ণ শরিয়ত যা কুরআন আকারে আল্লাহ্ তা'লা অবতীর্ণ করেছেন। এটি এক দিকে রমযানে কুরআন করিমের অবতীর্ণ হবার দিকে ইঙ্গিত বহন করে। যেভাবে কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

অর্থাৎ রমযান মাসে কুরআন করীম অবতীর্ণ করা হয়েছে। আর এ রমযানে সেই 'লায়লাতুল ক্বদর' রয়েছে যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। (বুখারী, হাদীস নং-৪৯৯৭)

সুতরাং সার কথা হল, রমযান মাসে কুরআন অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়েছে। আর যেভাবে হাদিস থেকে জানা যায়, এ মাসে জিবরাইল (আ.) রাসূলে করীম (সা.)-কে এর পুনরাবৃত্তি করাতেন।

অতএব, এর এও চাহিদা যে, যুগের প্রয়োজন এ বিষয়ের প্রত্যাশী ছিল যেন কোন পরিপূর্ন হেদায়েত অবতীর্ণ হয়; কেননা তা ছিল এক অন্ধকার যুগ। যেভাবে কুরআনে করিমে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **"জাহারাল ফাসাদু ফিল বার্‌রে ওয়াল বাহার"** অর্থাৎ জলে-স্থলে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়েছিল। সুতরাং সেই বিশৃঙ্খলার যুগের চাহিদা ছিল যেন হেদায়েত আসে। আল্লাহ্ তা'লা এ যুগের এ গুরুত্বের কারণে অর্থাৎ জলে-স্থলে যে বিবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল যার দৃষ্টান্ত অতীতেও ছিল না আর পরবর্তী যুগেও পাওয়া যায় না। কাজেই পরিপূর্ণ হেদায়েতের প্রয়োজন ছিল। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এ পরিপূর্ণ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। কুরআন করীমের অপর এক স্থানে এর উলেখ পাওয়া যায়। সূরা দুখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

حٰمٓ ۚ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۙ إِنَّآ أَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ۝ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ ۝ أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ۝ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

অর্থ ঃ অতিব প্রশংসিত এবং সম্মানের অধিকারী। হামীম এর অর্থ হল অতিব প্রশংসিত এবং সম্মানের অধিকারী। এ স্পষ্ট কিতাবের কসম, নিশ্চয়ই আমরা একে অতীব বরকতময় রাতে অবতীর্ণ করেছি। সর্বদাই আমরা (বিপথগামীদের) সতর্ক করে আসছি। এই (রাতে) প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আমাদের আদেশক্রমে। নিশ্চয় আমরাই রাসূল প্রেরণ করে থাকি। তোমার প্রভূ-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ। নিঃসন্দেহে তিনি সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞানী। (সূরা আদ্ দুখান, ২-৭)

সুতরাং এই বরকতময় যুগ এবং বরকতময়

রাত যার মাঝে আল্লাহ্ তা'লা মানুষের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে প্রকাশ্য, সুস্পষ্ট, আলোকিত এবং হেদায়াতেপূর্ণ কিতাব এই পরিপূর্ণ মানবের উপর অবতীর্ন করেছেন যিনি মানব সম্প্রদায়ের হেদায়াতের জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলেন। যিনি চাইতেন, মূর্তি পুজার পরিবর্তে বান্দা যেন তার সৃষ্টিকর্তার সামনে বিনয়াবনত হয়। যিনি চাইতেন, বান্দা যেন এক অধম মানুষকে আল্লাহ্‌র পুত্র বানিয়ে তার মৃত্যুকে নিজের মুক্তির মাধ্যম বানানোর পরিবর্তে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্ তা'লাকে সকল ক্ষমতার অধিকারী এবং ক্ষমার আধার মনে করে। সেই পরিপূর্ণ রাসূল (সা.) চাইতেন, মানুষ যেন অত্যাচার থেকে পরিত্রান লাভ করে। যেখানে খোদা তা'লার পরিপূর্ণ আনুগত্য করা হয় সেখানে যেন খোদার বান্দার অধিকারও সংরক্ষিত হয়।

সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা এ পরিপূর্ণ মানবের দোয়া শুনেছেন এবং পরিপূর্ণ মানবের ওপর পরিপূর্ণ শরিয়ত কুরআন করীম অবতীর্ণ করছেন। সেই পরিপূর্ণ কিতাব অবতীর্ণ করছেন যা শুধুমাত্র চৌদ্দশত বছর পূর্বের অন্ধকার যুগে হেদায়াতের কারণ হয়নি বরং এ পরিপূর্ণ কিতাব এখন কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত সব ধরণের আধার দূরীকরণের কারণ হয়েছে। আর এই রাসূল এখন কেয়ামত পর্যন্ত খাতামূল আম্বিয়া এবং শেষ শরিয়তধারী নবী থাকবেন।

আর যখনই আল্লাহ্ তা'লার উৎকণ্ঠিত বান্দারা যুগের ইতিহাস দেখে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে অবনত হবে এবং চিৎকার করবে তখন আল্লাহ্ তা'লা **ইন্নাহু হুওয়াস সামিউল আলীম** (অর্থাৎ নিঃসন্দেহে তিনিই অতীব শ্রবনকারী এবং সর্বজ্ঞাতা)-এর বাণী পূর্ণ করার মাধ্যমে বান্দাদের সান্ত্বনার উপকরণ সৃষ্টি করেন ও করবেন। আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে তাঁর অঙ্গিকার এবং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর সত্যিকার প্রেমিককে তাঁর (সা.) দাসত্বে প্রেরণ করেছেন। এই প্রকৃত দাস এবং মসীহ্ ও মাহদী একস্থানে লায়লাতুল ক্বদরের যে তফসীর করেছেন তা আমি এখন বর্ণনা করছি।

তিনি বলেন, যা সূরা আল্ ক্বদরের মর্মার্থ নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করলে একটি নিশ্চিত যে সূক্ষতত্ত্ব জানা যায় তা হল, খোদা তা'লা এ সূরায় সুস্পষ্ট ও দ্ব্যার্থহীন ভাষায় বলে দিয়েছেন, পৃথিবীতে যখন কোন ঐশী সংশোধনকারী আসেন তখন তাঁর সাথে আকাশ থেকে ফিরিশতা অবতীর্ণ হয়ে অপেক্ষমান লোকদেরকে সত্যের দিকে আকৃষ্ট করে। সুতরাং এ আয়াতের অর্থ হতে এ নতুন কল্যাণ অর্জিত হয় যে, চরম পথভ্রষ্টতা এবং অবহেলার যুগে যদি একবার, অলৌকিক ভাবে মানুষের শক্তির মাঝে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধর্মের অণুসন্ধানের প্রতি গতির সঞ্চার হওয়া শুরু হয়ে যায় তবে তা এ বিষয়ের প্রমাণ বহন করবে যে, কোন ঐশী সংশোধনকারীর জন্ম হয়েছে। কেননা রুহুল কুদুসের অবতীর্ণ হওয়া ব্যতীত এমন গতি সঞ্চারিত হওয়া অসম্ভব। আর এ গতি যোগ্যতা ও প্রকৃতি অনুযায়ী দুই ধরণের হয়ে থাকে। হরকতে তাম্মাহ (পূর্ণাঙ্গিন গতি) এবং হরকতে নাকেসা (অপূর্ণাঙ্গিন গতি)। হরকতে তাম্মাহ হল সেই গতি যা আত্মার মাঝে পরিচ্ছন্নতা ও সরলতা দান করে এবং চিন্তা-চেতনাকে তীক্ষ্ণ করে সত্য-মূখী করে।

আর হরকতে নাকেসা হল সেই গতি যা রুহুল কুদুসের আন্দোলনের ফলে চিন্তা-চেতনা কিছুটা তো ক্রিয়াশীল হয় কিন্তু যোগ্যতা ও নিষ্ঠার অভাবের জন্য তা সত্যাভিমূখী হতে পারে না বরং সে এ আয়াতের সত্যায়নকারী হয়ে যায়, فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا

অর্থাৎ চিন্তা-চেতনা গতিশীল হওয়ার ফলে তার পরবর্তী অবস্থা পূর্ববর্তী অবস্থার তুলনায় জঘন্য হয়ে যায়। যেভাবে সকল নবীদের যুগে এমনই ঘটেছে অর্থাৎ তাদের আবির্ভাবের সাথে যখন ফিরিশতারা অবতীর্ণ হয়েছে তখন ফিরিশতাদের অভ্যন্তরীণ আন্দোলনে প্রত্যেক প্রকৃতি সাধারণ ভাবে আন্দোলিত হয়েছে। তখন পূণ্যবানদের সন্তানেরা সেই সব পূণ্যবানদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে আর দুষ্ট ও শয়তানের বংশধররা সেই আন্দোলনের ফলে অবহেলার স্বপ্ন থেকে তো জাগ্রত হয়েছে এবং ধর্মীয় বিষয়ের প্রতি মনোযোগীও হয়েছে কিন্তু সত্য চেনার যোগ্যতার অভাবে সত্যাভিমূখী হতে পারেনি। সুতরাং ঐশী সংস্কারকের সাথে অবতীর্ণ ফিরিশতাদের ক্রিয়া প্রত্যেক মানুষের ওপরই সক্রিয় হয় । কিন্তু এ ক্রিয়ার ফলে পুন্যবানদের ওপর উত্তম প্রভাব এবং দুষ্টদের ওপর মন্দ প্রভাব পড়ে।..... যেভাবে এখনই আমরা উপরে বর্ণনা করে এসেছি,

فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا

এ পবিত্র আয়াতটি এই বিভিন্ন ধরনের প্রভাবের দিকেই ইঙ্গিত করছে।

হুযূর (আ.) বলেন, এ কথাটি স্মরণ রাখার যোগ্য যে, প্রত্যেক নবীর আবির্ভাবের সময় একটি লায়লাতুল ক্বদর হয়ে থাকে। যার মাঝে সেই নবী এবং কিতাব যা তাঁকে দেয়া হয়েছে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয় আর ফিরিশতারাও আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু সবচেয়ে বড় লায়লাতুল ক্বদর সেটি যা আমাদের নবী (সা.) কে দেয়া হয়েছে। মোটকথা সেই লায়লাতুল ক্বদরের আঁচল মহানবী (সা.)-এর যুগ থেকে কেয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত। আর মানুষের আত্মিক ও চিন্তা শক্তির যে ক্রিয়া নবী করীম (সা.)-এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত হচ্ছে তা লায়লাতুল ক্বদরের প্রভাবেই হচ্ছে। শুধু পার্থক্য হল, সেই ক্রিয়া ভাগ্যবান লোকদের চিন্তা শক্তির মাঝে পূর্ণ ও দৃঢ়ভাবে হয়ে থাকে।

আর হতভাগ্য লোকদের চিন্তাশক্তি বক্রতা এবং দৃঢ়তাহীণ ভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। আর পৃথিবীতে যখন নবী করীম (সা.)-এর কোন প্রতিনিধি জন্মগ্রহণ করে তখন এ ক্রিয়া অত্যন্ত জোড়ালো ভাবে নিজ কর্ম সম্পাদন করে। বরং সে প্রতিনিধি মাতৃগর্ভে আসের যুগ থেকেই গুপ্তভাবে মানবিয় শক্তি কিছুটা ক্রিয়াশীল হওয়া শুরু করে এবং তাদের মাঝে যোগ্যতা অনুযায়ী একটি গতির সঞ্চার হয়। আর সে প্রতিনিধির প্রতিনিধিত্ব লাভের সময় সেই ক্রিয়া অত্যন্ত গতিশীল হয়ে যায়।

সুতরাং হযরত রাসূলে করীম (সা.)-এর প্রতিনিধির আবির্ভাবের সময় যে লায়লাতুল ক্বদর নির্ধারণ করা হয়েছে তা মূলত সেই লায়লাতুল কদরেরই একটি শাখা। অথবা এভাবে বলতে পারি যে, নবী করীম (সা.) যা পেয়েছেন এটি তার প্রতিবিম্ব। আল্লাহ্ তা'লা এ লায়লাতুল ক্বদরের মর্যাদা অতি উচ্চ করেছেন। যেভাবে এর স্বপক্ষে কুরআন করীমের এ আয়াত রয়েছে, **فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ** অর্থাৎ কেয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত এ লায়লাতুল ক্বদরের যুগে সকল প্রকার প্রজ্ঞা এবং জ্ঞানের বিষয় পৃথিবীতে প্রকাশ করা হবে। আর বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির গুপ্ত বিষয়গুলোকে আশ্চর্য্যজনক ভাবে ধরাপৃষ্ঠে ছড়িয়ে দেয়া হবে। আর মানবীয় শক্তির মাঝে এর বিভিন্ন যোগ্যতা ও ধরণ অনুযায়ী বিকাশযোগ্য যে দক্ষতা সুপ্ত রয়েছে বা যতটা উন্নতি করতে সক্ষম তার সবটাই প্রকাশ করা হবে। কিন্তু নবী করীম (সা.) এর কোন প্রতিনিধি যখন পৃথিবীতে আবির্ভূত হবে তখন এ সব বিষয় অত্যন্ত জোড়ালভাবে ক্রিয়াশীল হতে থাকবে।

মূলতঃ এ আয়াতটিকেই সূরাতুল যিলযাল-এ বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা সূরাতুল যিলযালের পূর্বে সূরাতুল ক্বদর অবতীর্ণ করে এটি সুস্পষ্ট করেছেন যে, আল্লাহ্‌র সুন্নত এ নিয়মেই চলছে যে, আল্লাহ্ তা'লার কালাম লায়লাতুল ক্বদরেই অবতীর্ণ

হয় এবং তাঁর নবীও পৃথিবীতে লায়লাতুল কদরেই আবির্ভূত হন। আর লায়লাতুল কৃদরেই ফিরিশতারা অবতীর্ণ হয় যাদের মাধ্যমে জগতে পুণ্যের দিকে গতির সঞ্চার হয় আর তারা পথভ্রষ্টতার অন্ধকার রাত থেকে শুরু করে ঊষার উদয় পর্যন্ত (সত্য গ্রহণের জন্য) প্রস্তুত হৃদয়গুলোকে সত্যের দিকে আকৃষ্ট করার কাজেই নিয়োজিত থাকে। (ইযালায়ে আওহাম, রুহানী খাযায়েন, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫৫-১৬০)

অতএব এই হল চমৎকার সেই ব্যাখ্যা যার উলেখ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন পুস্তকে করেছেন, যেভাবে আমি বলেছি। এটি একটি উদাহরণ। বিশ্ববাসী, বিশেষ করে মুসলমানরা যদি এ বিষয়টি বুঝতে পারে তবে তারা খোদা তা'লার এ প্রতিনিধির বিরোধীতার পরিবর্তে তার সাহায্যকারী হয়ে যাবে। তিনি যে দলিল উপস্থাপন করেছেন তা অত্যন্ত জোরালো দলিল। যে সব লোক বলে, আমরা শান্তি ও নিরাপত্তা চাই, যুগের সংশোধনের জন্য একজন সংশোধনকারীর অন্বেষণ করছি, অথবা হাদীসে বর্ণিত মসীহ্ ও মাহদী (আ.)-এর যুগের চিহ্ন অনুযায়ী মসীহ্ এবং মাহদীর আগমনের জন্য অপেক্ষমান তাদের জন্য এ কথাগুলো মনোযোগ আকর্ষণকারী হওয়া উচিত। এমন লোকদের উচিত হযরত মসীহ্ (আ.)-এর এ কথাগুলোর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আমি পড়লাম তাতে এ কথাগুলোও আছে যে,"'চরম পথভ্রষ্টতা এবং অবহেলার যুগে যদি একবার অলৌকিক ভাবে মানুষের শক্তির মাঝে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধর্মের অণুসন্ধানের প্রতি গতির সঞ্চার হওয়া শুরু হলে তা এ বিষয়ের প্রমাণ বহন করবে যে, কোন ঐশী সংশোধনকারীর জন্ম হয়েছে। কেননা রুহুল কুদুসের অবতীর্ণ হওয়া ব্যতীত এমন গতি সঞ্চারিত হওয়া অসম্ভব।"

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর যুগের সমসাময়িক আলেম এবং নেক লোকদের লেখা পড়লে ও তাদের কথা শুনলে দেখবেন, সবই এর সাক্ষ্য বহন করছে যে, এটা মসীহ্ ও মাহদীর আগমনের যুগ, তারা মসীহ্র আগমনের অপেক্ষায় কারও জন্য প্রতিক্ষারত ছিল। কিন্তু যখন হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) দাবী করলেন তখন তাদের মধ্য থেকেই একটি শ্রেণী তাঁর বিরোধিতা করা শুরু করল। আর অনেকেই তাদের ইহকাল ও পরকালকে সুসজ্জিত করার পরিবর্তে ধ্বংস করল। আর অনেকেই এমন ছিলেন যারা তাদের ইহকাল এবং পরকাল সুন্দর করার উপকরণ সংগ্রহ করলেন। মানুষের মাঝে আজও এ উদ্বেগ রয়েছে। বিভিন্ন সময় প্রশ্ন উঠে থাকে, কখনো কখনো পত্রিকায় বিবৃতি আসে, কোন মসীহ্র প্রয়োজন; কেউ বলে, মুসলমানদের সংগঠিত করতে খিলাফতের প্রয়োজন। কিন্তু মসীহ্ মাওউদ না আসা পর্যন্ত খেলাফত কিভাবে জারি থাকতে পারে? এসব কথা, যা কিছু হচ্ছে বা বিবৃতি দেয়া হচ্ছে অথবা মানুষের উপলব্ধি এ কথারই প্রমান বহন করে যে, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আগমনকারী এসে গেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ দলিল-ই দিয়েছেন। তাইতো মানুষের হৃদয়ে এ সব আন্দোলন জন্ম নিয়েছে।

হুযূর (আ.) বলেছেন, যখন আল্লাহ্ তা'লার প্রতিনিধি আসেন তখন দুই ধরনের গতির সঞ্চার হয়, পূর্ণাঙ্গিন গতি ও অপূর্ণাঙ্গিন গতি। একটি সঠিক ও পূর্ণাঙ্গিণ গতি এবং অপরটি দূর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ গতি। সঠিক ও পূর্ণাঙ্গিন গতির মাধ্যমে আত্মা পরিচ্ছন্ন হয়। খোদা তা'লার কাছে সঠিক পথের দিশা চাওয়া হয় আর আল্লাহ্ তা'লা পথ দেখান। জ্ঞান-বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে মানুষ সত্যকে চিনে নেয়। কিছু নিদর্শন প্রকাশ পেতেই সেগুলোকে ইশারা মনে করে সত্যকে সনাক্ত করে নেয়। এমনিতেও অনেক পূণ্য আত্মাকে আল্লাহ্ তা'লা পথ দেখিয়ে দেন। মহানবী (সা.)-এর যুগে এমন সরলমনা মানুষ যাদের হৃদয়ে পুন্য ছিল, যারা তাদের চিন্তা চেতনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছে তারা তাঁকে চিনতে পেরেছেন। কিন্তু আবু জেহেলের মত লোকেরা যারা নিজেরাই নিজেদের বিচক্ষণ মনে করতো তারা বঞ্চিত থেকেছে এবং ধ্বংস হয়েছে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর যুগেও হযরত মাওলানা হেকিম নুরুদ্দীন (রা.) খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর কথা ধরুন, হযরত সাহেবযাদা শহীদ আব্দুল লতিফ (রা.)-এর কথা ধরুন। এ সব লোক দূরবর্তী স্থানে থেকেও সমস্ত দূরত্বকে দূরীভূত করে তাঁর চরণে স্থান করে নিয়েছেন এবং তাঁকে গ্রহণ করেছেন। আর মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভীর মত লোক যে কাছে ছিল, যে বাল্য বন্ধু ছিল সে শত্রুতা বশতঃ বঞ্চিত হল। এ সব বঞ্চিত লোকদের সম্বন্ধে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, সত্য চেনার যোগ্যতার অভাবে সত্যাভিমূখী হতে পারে না। সুতরাং তাদের যোগ্যতা নেকী এবং সত্য গ্রহণের সামর্থই রাখে না। তাদের হৃদয় বক্র হয়ে থাকে, হৃদয়ে অহংকার থাকে এবং স্বার্থপর হয়ে থাকে তাই আল্লাহ্ তা'লাও তাদেরকে সাহায্য করেন না এবং পথ দেখান না। বরং তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

হুযূর (আ.) বলেন,

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا

অর্থাৎ এমন লোকদের চিন্তা চেতনা ইতিবাচক দিকের পরিবর্তে নেতিবাচকের দিকে ধাবিত হয়। আর এ নেতিবাচক চিন্তার কারণে তাদের আধ্যাত্মিক অবস্থা পূর্বের তুলনায় খারাপ হয়ে যায়। সুতরাং আজও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অস্বীকারকারীদের একই অবস্থা। তারা নিজেদের মন মতো নেকীর কথা বললেও এ সব নেকীর কথা কোন প্রভাব বিস্তার করে না। কেন করে না? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে বিরোধিতার কারণে এবং আল্লাহ্ তা'লার নিয়তিও এর কুফল সৃষ্টি করেন। যখন আল্লাহ্ তা'লার প্রতিনিধির বিরোধিতা করা হয় তখন মুখে ভাল কথারও কোন প্রভাব থাকে না, নিঃসন্দেহে মন্দ কথা থাকে। তাদের কথায় কোন আধ্যাত্মিকতা থাকে না। তাদের প্রতিটি কথা প্রমাণশূণ্য হয়ে থাকে।

আল ফজল ইন্টারন্যাশনালে তাহের নাদিম সাহেব আরবদের অবস্থা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে থাকেন। এবারও আল ফজলে তাহের হানী সাহেব যিনি আমাদের আরবের অধিবাসী এবং ওয়াকেফে জীন্দেগী আর আরবী ডেস্কে অনেক পরিশ্রমের সাথে কাজ করে থাকেন। তার আহমদীয়াত গ্রহণের ঘটনা তার মৌখিক বর্ণনা হচ্ছিল। হানী সাহেব বলেন, আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে আমার চেষ্টা থাকত, আমি যেন আহমদীয়াত প্রতিরোধ ও বিরোধিতার ক্ষেত্রে সব ধরণের সাহায্য পাই ও অস্ত্র ব্যবহার করি। কিন্তু, কয়েকটি বই পড়ার পর তিনি প্রমাণের জন্য এক আলেমের কাছে গেলেন। তার দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তি এতটাই জ্ঞানী ছিল যে, সে এক মুহূর্তের মধ্যেই হযতর মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবি বা জামা'তের উপস্থাপিত যুক্তি-প্রমানের খন্ডন করতে সক্ষম বা তার মাঝে এমন যোগ্যতা আছে যার মাধ্যমে সে খন্ডন করতে পারে। তিনি বলেন, আমি কয়েক দিন যেতে থাকলাম এবং তাকে পড়ার জন্য বইও দিলাম, সেই আলেম সব কিছু পড়ার পর কোন যৌক্তিক, কুরআন বা হাদীসের ভিত্তিতে এর বিপক্ষে দলিল দেবার পরিবর্তে বা তা খন্ডন করার পরিবর্তে কেবল এতটুকুই বলতেন, দেখ তো! এ কিতাবে কেমন কাঁচা কথা লেখা হয়েছে, এ সব অযথা কিসব কথা লেখা হয়েছে। একই

ভাবে তিনি বলেন, একবার মোস্তফা সাবেত সাহেবের সথে আমি তার মোনাযেরা করিয়ে দিলাম কিন্ত সেখানেও সারাটা রাত অপচয় ছাড়া তিনি আর কিছুই করেন নি। অবশেষে তিনি এ নামসর্বস্ব আলেমকে পরিত্যাগ করলেন যাকে তিনি অনেক বড় আলেম মনে করতেন। আর আল্লাহ্ তা'লা তাকে সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করলেন। (আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৭ আগষ্ট থেকে ২সেপ্টেম্বর ২০১০ইং পৃষ্ঠা ৩-৪)

অতএব, ধর্মীয় জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার প্রতিনিধির যুগে এ সব ধর্মীয় আলেমদের আধ্যাত্মিকতা এবং ধর্মীয় বিষয়ে যুক্তি-প্রমাণ শেষ হয়ে যায়। আর আমি যেভাবে বলেছি, বিরোধিতার কারণে আধ্যাত্মিকতা নষ্ট হয়ে যায়। আর যখন আধ্যাত্মিকতা নষ্ট হয়ে যায় তখন ধর্মীয় জ্ঞানও থাকে না এবং থাকতে পারে না। কেননা এটি খোদাভীতি ও আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে এসে থাকে। যখন আল্লাহ্ তা'লার প্রেরিতের বিরোধিতা শুরু হয় তখন খোদভীতিও শেষ হয়ে যায়। তাই হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, পূণ্যবানদের সন্তানেরা সেই সব পূণ্যবানদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে আর দুষ্ট ও শয়তানের বংশধররা সেই আন্দোলনের ফলে অবহেলার স্বপ্ন থেকে তো জাগ্রত হয়েছে এবং ধর্মীয় বিষয়ের প্রতি মনোযোগীও হয়েছে কিন্তু সত্য চেনার যোগ্যতার অভাবে সত্যাভিমূখী হতে পারেনি।

সুতরাং আজও আমরা দেখছি, ধর্মের প্রতি অনুরাগের দাবি আছে কিন্তু আধ্যাত্মিক দিক-নির্দেশনার অভাবে ধর্মের নামে শুধু শয়তানী কাজ রয়েছে। আজ যদি আপনারা অনুসন্ধান করেন তবে দেখবেন এসব লোকেরাই ধর্মের নামে হত্যা করছে। আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর যে উদ্ধৃতিটি পড়েছি তাতে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) লায়লাতুল ক্বদরের আলোকে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করেছেন আর তা হল, নবী করীম (সা.) কে প্রকৃত লায়লাতুল ক্বদর পদান করা হয়েছে। আর এ লায়লাতুল ক্বদরের যুগ কেয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এরই ফলে পুন্যবান সহজ সরল পথের দিকে আসছে। আজও সেই লায়লাতুল ক্বদরের কল্যাণ জারি রয়েছে যা নেকী এবং আধ্যাত্মিকতার উন্নতির কারণ হচ্ছে। কিন্তু যারা হতভাগা ও দুর্ভাগা তারা সঠিক পথ থেকে সরে আছে এবং সরে যাচ্ছে, শয়তানের বংশধরে পরিনত হচ্ছে, ধ্বংসের গহ্বরে পতিত হতে চলেছে।

নবী করীম (সা.)-এর লায়লাতুল ক্বদরের যুগ তাঁর প্রতিনিধি এবং মসীহ মাওউদের মাধ্যমে দ্বিতীয়বার প্রতিচ্ছবিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং আমি যেভাবে বর্ণনা করেছি, এ যুগের লায়লাতুল কদরের মর্যাদা করে এবং চেনার মাধ্যমে আমরা লায়লাতুল ক্বদরকে পেতে পারি। সুতরাং মানুষের অবস্থা ধর্মের প্রতি সঠিক হওয়া এবং সরল প্রকৃতির হয়ে কল্যাণমন্ডিত হওয়া অথবা নিজ ধ্যান ধারণায় ধর্মের ঠিকাদার সেজে ধর্মের নামে অত্যাচার ও বর্বরোচিত কর্ম করা এবং খুন করা একই ভাবে বিভিন্ন আবিষ্কারের বিস্তৃতি লাভ, এর কতক আবিষ্কার বর্তমানে মানুষের মূল্যবোধ এবং নৈতিকতাকে পদদলিত করার মাধ্যম হিসেবে আর কিছু আবিষ্কার এমনও রয়েছে যা মু'মিনদের কল্যাণের জন্য ব্যবহার হচ্ছে। যা খোদা তা'লার বাণী, জ্ঞান এবং কল্যাণ বিস্তারের মাধ্যম হচ্ছে। এ সব ইতিবাচক ও নেতিবাচক কথা আল্লাহ্ তা'লার প্রেরিত ব্যক্তির আগমন এবং লায়লাতুল ক্বদর সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ বহন করছে।

এখানে এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন ফিরিশতাদের অবতরণের ধারা ঊষার উদয় পর্যন্ত চলতে থাকে। নবী করীম (সা.)-এর যুগ লায়লাতুল ক্বদরের সেই বিশেষ যুগ ছিল যখন ফিরিশতারা প্রশান্তি নিয়ে আগমন করতে থাকে এমনকি তাঁর (সা.) এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার সময় হলে, তিনি সফলতা দেখেছেন, বিজয় দেখেছেন। ইসলামের বিজয় হল। এটি ছিল ঊষার উদয়। সে যুগ তো আর পুণরায় আসতে পারে না। যখন দ্বীন পূর্ণতা লাভ করেছে এবং আল্লাহ্ তা'লার নেয়ামত পূর্ণ হয়েছে, পরিপূর্ণ শরিয়ত কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে; অতএব, সে এক যুগ ছিল যা গত হয়েছে। কিন্তু যেভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, রাসূলের প্রতিনিধির যুগে তা প্রতিচ্ছায়ারূপে প্রকাশিত থাকে। মহানবী (সা.)-এর পর খিলাফতে রাশেদার যুগে এ আলোকিত প্রভাত ত্রিশ বছর পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল। এর পর ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিক অন্ধকার ছড়িয়ে পড়া শুরু হল এবং পরিপূর্ণ অন্ধকার যুগ চলে এলো যা নবী করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ছিল। অতঃপর তাঁর প্রতিচ্ছায়ার আবির্ভাবের সাথে রূপক লায়লাতুল কদরের এক নতুন যুগের সূচনা হল।

এখন আমরা যে যুগ অতিবাহিত করছি তা ঊষা উদিত হওয়ার পরের যুগ। একদিক থেকে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর সে যুগও শেষ হয়ে গেছে। এ দিন যখন শুরু হয়েছে তখন এ থেকে কল্যান লাভের লক্ষ্যে এ যুগে ইসলাম এবং আহমদীয়াতের জন্য যে বিজয় নির্ধারিত, তাকে জাগতিক আতিসয্য থেকে রক্ষা করতে এবং আধ্যাত্মিকতার মান উন্নত করতে আল্লাহ্ তা'লা প্রতি বছর আমাদেরকে পুনরায় রমযানে লায়লাতুল ক্বদরের কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

যেভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, মহানবী (সা.)-এর যুগ লায়লাতুল ক্বদরের যুগ ছিল এবং তা কেয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। অর্থাৎ একদিক থেকে তো তাঁর (সা.) আগমন এবং কুরআন করীম অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে তা শেষ হয়ে গেছে এবং ঊষার উদয় হয়েছে। কিন্তু একদিক থেকে তা জারি থাকবে তাই এ লায়লাতুল ক্বদর পেতে হলে কুরআন এবং রমযানের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালন করুন। এর মাঝে উম্মতের জন্য বার্তা হল, উম্মতও রমযানের একটি রাত যাকে লায়লাতুল ক্বদর বলা হয় তা থেকে কল্যাণমন্ডিত হতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা বার বার আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি করে মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং যদি এ অনুগ্রহ অনুধাবন করে আমরা আমাদের দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে থাকি তবে নবী করীম (সা.)-এর জারিকৃত কল্যাণ থেকে লাভবান হতে থাকব।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সর্বদা তাঁর কল্যাণরাজী দান করতে থাকুন। আমাদের শত্রু যারা নিজ ধ্যানধারণা অনুযায়ী দিন-রাত আমাদের বিপদগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে অথবা আমাদেরকে অন্ধকারে দেখতে চাচ্ছে এবং আমাদের ধ্বংস কামনা করছে। নিজেদের ধারণা প্রসূত তারা আমাদেরকে ধ্বংস করতে চায়, কিন্তু ঐশী জামা'ত কখনো বিনাশ হয় না ধ্বংস হতে পারে না। বর্তমানে আমাদের ওপর যে সংকীর্ণতা সৃষ্টি করা হচ্ছে বিশেষ করে পাকিস্তানে, আল্লাহ্ করুন এগুলো যেন লায়লাতুল ক্বদরের উপকরণ আনয়নের কারণ হয় এবং আমরা যেন ঊষার উদয়ের দৃশ্য দেখতে পাই যা সর্বদার জন্য প্রশান্তি এবং বিজয়ের অবস্থায় প্রকাশিত হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেই সৌভাগ্য দান করুন। (আমীন)

**অনুবাদ : মওলানা মুহাম্মদ আক্রামুল ইসলাম**
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

**[পূণর্মুদ্রিত]**

# রমযান মাসের ফযিলত ও বরকত

*মওলানা শরীফ আহমদ,* শিক্ষক, জামেয়া আহ্‌মদীয়া বাংলাদেশ

**‘যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকেনা আল্লাহ্ তা’লার জন্য তার উপবাস থাকা এবং পিপাসার্ত থাকার কোন প্রয়োজন নাই’**

আলহামদুলিল্লাহ্! সমস্ত বিশ্বের মুসলমানরা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে পুনরায় আর একবার পবিত্র এবং বরকতপূর্ণ মাসে প্রবেশ করার তৌফিক পেয়েছে। এই বরকতপূর্ণ মাসকে ইসলামী পরিভাষায় “রমযানুল মোবারক” নামে স্মরণ করা হয়। ইসলামী কেলেন্ডার অনুযায়ী রমযান মাস হলো নবম মাস এবং প্রত্যেক বছর পূর্বের বছর থেকে নয় অথবা দশ দিন আগে এই রমযান শুরু হয়। কেননা ইসলামী মাস চান্দ্র মাসের তারিখ অর্থাৎ চাঁদ উদয় থেকে শুরু হয়।

ইসলামের ভিত্তি ৫টি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হলো রোযা। রোযাও একটি ইবাদত যেভাবে মানুষ অন্যান্য ইবাদত করে। যেমন- নামায এবং হজ্জ ইত্যাদি আদায় করে থাকে। ঠিক সেভাবেই মুসলমানের ওপর বছরে একবার একমাস রোযা রাখা ফরয করা হয়েছে। কেননা রোযা মানুষের মধ্যে এক ধরনের বিনয়, ধৈর্য, সহ্য-ক্ষমতার সৃষ্টি করে থাকে। আর মানুষ তার নিজের নাফসের সংশোধনও করে থাকে। ইসলামী পরিভাষায় সূর্য উঠার অর্থাৎ সুবহ্ সাদেক থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত ইবাদতের নিয়্যতে খাবার দাবার, অযথা কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার নাম হলো রোযা। যে ব্যাক্তি রোযা রেখে বৃথা কাজকর্ম করে, মিথ্যা কথা বলে, ধোকা দেয় সেটি তার জন্য রোযা নয়। বরং শুধুমাত্র উপবাস থাকারই নামান্তর।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা এবং এর ওপর আমল করা থেকে বিরত থাকেনা আল্লাহ্ তা’লার জন্য তার উপবাস থাকা এবং পিপাসার্ত থাকার কোন প্রয়োজন নাই। অর্থাৎ তার রোযা রাখা বেকার বলে গণ্য হবে। (বুখারী, কিতাবুস্ সওম)

অর্থাৎ যখন মানুষ রোযার প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে গাফেল হয়ে যায় তখন সে শুধু নিজেকে উপবাসই রাখে যা খোদা তা’লার জন্য কোন প্রয়োজন নাই।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) অপর একস্থানে বলেন, রোযা শুধুমাত্র খাবার দাবার থেকে বিরত থাকার নাম নয়। বরং সব ধরনের অশ্লিল কথাবার্তা, কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকাও এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং হে রোযাদারগণ ! যদি তোমাদের কেউ গালি দেয় এবং রাগা-রাগি করে, তোমাদের সাথে ঝগড়া বিবাদ করে তাহলে তুমি তাদের বলে দাও যে, আমি রোযাদার। যদি কেউ রোযাদার হওয়া সত্ত্বেও গালি গালাজ করে তাহলে তার রোযা রাখা শুধু উপবাস থাকারই নামান্তর। সে কিছুই অর্জন করতে পারবে না।

### রোযার উদ্দেশ্য ঃ-

বরকতময় রমযান মাসে এবং রমযান ছাড়া যখনই মানুষ নফল রোযা রাখে তখন এর উদ্দেশ্য হলো নাফসের সংশোধন। কেননা মানুষ যখন আল্লাহ্ তা’লার জন্য জাগতিক আরাম-আয়েশ, চাওয়া পাওয়া ইত্যাদি থেকে বিরত থাকে তখন সে তার নাফসকে নেকীর ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখতে অধিক শক্তি পায়। কিন্তু এ বিষয়টি স্মরণ রাখা উচিত, রোযার প্রকৃত উদ্দেশ্য উপবাস থাকা নয়। যদি উপবাস থাকার ফলে খোদার জান্নাত পাওয়া যেত তাহলে প্রতিটি ব্যক্তি এ জান্নাত পাওয়ার চেষ্টা করতো। কেননা উপবাস থেকে মরে যাওয়া কোন কঠিন বিষয় নয়। কঠিন বিষয় হলো আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক পরিবর্তন সাধন করা।

আপনারা হয়তো দেখেছেন, শুনেছেন এবং খবরের কাগজেও পড়েছেন। মানুষ তার অধিকার আদায়ের জন্য আমরণ অনসন করে থাকে। অতএব অনাহারে থাকা কোন কঠিন বিষয় নয়। আর এটা রমযানের উদ্দেশ্য ও নয়।

সুতরাং রোযার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো, মানুষের নাফস যেন পবিত্র হয়। আর এর দ্বারা তার হৃদয়ে যেন খোদার জ্যোতির

বিকাশ ঘটে। আবার এথেকে মানুষের শারিরিক, চারিত্রিক, আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক কল্যাণও লাভ হয়। যেভাবে খাবার খাওয়ার ফলে মানুষ তার শারিরিকভাবে শক্তি পায় ঠিক সেভাবে রোযা রাখার ফলশ্রুতিতে মানুষ তার রুহে শক্তি লাভ করে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'আর যদি তোমরা রোযা রাখ এটা তোমাদের জন্য উত্তম' (সূরা বাকারা-১৮৫)।

রোযা রাখলে মানুষের শারিরিক কল্যাণও লাভ হয়। অর্থাৎ শারিরিক কষ্ট এবং বিভিন্ন সমস্যাদি সহ্য করা অভ্যাসে পরিণত হয়। এতে ধৈর্য ক্ষমতা সৃষ্টি হয় এবং ডাক্তারি দিক নির্দেশনা অনুযায়ী কম খেলে শারিরিক স্বাস্থ্য ভাল থাকে। আর এই নির্দেশনা চৌদ্দশত বছর পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এভাবে বর্ণনা করেছেন 'সুমু তাসেহ্হু' অর্থাৎ রোযা রাখ এতে করে তোমাদের শারিরিক স্বাস্থ্য ভাল থাকবে।

মোটকথা, রোযা শারিরিক সুস্থতার কারন আর আধ্যাত্মিক দিক থেকে এর এ কল্যাণও আছে যে, এর দ্বারা মানুষ মন্দ থেকে বাঁচতে পারে, পবিত্র, নেক, উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয়। আর এতে করে মানুষের মধ্যে দিয়ানত ও আমানতের অভ্যাস সৃষ্টি হয়। অত:পর রোযা দ্বারা মানুষের আরো একটি বড় ধরনের কল্যাণ সাধিত হয়। যার ফলে মানুষ গরীবদের কষ্টের বিষয়টি বুঝতে পারে, অনুভব করতে পারে। আর তাদেরকে সাহায্য করার অনুভুতি হৃদয়ে সৃষ্টি হয়।

## রোযার ফযিলত এবং গুরুত্ব ঃ

রোযার ফযিলত ও গুরুত্ব সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন- হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কতৃক বর্ণিত, রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "ইবনে আদমের প্রতিটি নেক আমল বাড়িয়ে দেয়া হবে। দশগুণ থেকে সাতশত গুণ প্রতিদান দেয়া হবে। কিন্তু রোযার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, রোযা আমার জন্য রাখা হয়। আর এর জন্য আমি নিজে এর প্রতিদান দিব। (অথবা আমি স্বয়ং এর প্রতিদান হয়ে যাব) কেননা রোযাদার তার চাহিদা এবং খাবার খাওয়া আমার জন্য ছেড়ে দেয়। তিনি (সা.) আরেক স্থানে বলেন-যে ব্যক্তি রোযাদার সে যদি চুপ থাকে তাহলে সেটাও তার জন্য ইবাদত, তার ঘুমও ইবাদত হিসাবে গণ্য করা হবে। তার দোয়া গ্রহণীয় হবে। আর তার আমলের প্রতিদান বাড়িয়ে দেয়া হবে।

অত:পর বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে রমযানের ফযিলত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন, যখন রমযান আসে তখন জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। আর শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করা হয়। নবী করীম (সা.) আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, যেখানে যেখানে এবং যে যে স্বত্ত্বা রমযান মাসে প্রবেশ করেছে সেই স্বত্ত্বা নূরানী হয়ে যায় এবং তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়। আর শয়তানকেও শিকল দিয়ে বেধে রাখা হয়। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি রমযানের আগমন থেকে কল্যাণ না উঠায় তাহলে এই হাদীস তার জন্য প্রয়োগ হবে না।

অপর এক হাদীসে এসেছে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) বলেছেন, দু ধরনের ব্যক্তি বড়ই হতভাগ্যের অধিকারী। প্রথমত যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে পেয়েছে অথচ তাদের সেবা শুশ্রুষা করতে পারে নাই। আর এভাবে সে জান্নাতে যেতে পারে নাই। আর দ্বিতীয়ত ঐ ব্যক্তি যার জীবনে রমযান এসেছে আর সে তার কদর করে নাই। অর্থাৎ রোযার শর্তানুযায়ী রোযা রাখে নাই আর এভাবে তার গুনাহ্ ক্ষমা করা হয় নাই।

মহানবী (সা.) আরেক স্থানে বলেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানী অবস্থায় এবং নেকীর নিয়্যতে রমযানের রোযা রাখে তার পিছনের সমস্ত গুনাহ্ মা'ফ করে দেয়া হয়' (বুখারী)।

## রোযা কাদের ওপর ফরয ঃ

প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক, বুদ্ধিমান, সুস্বাস্থের অধিকারী সমগ্র মুসলমান নারী-পুরুষদের ওপর রমযানের রোযা রাখা ফরয। মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তিদের রোযা না রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ সফরে থাকলে ও অসুস্থ থাকলে রোযা রাখবে না। বরং রমযানের পরে পরবর্তী রমযানের পূর্বে এ রোযা রাখবে এবং গননা পূর্ণ করবে। যারা চির রোগী, দুর্বল এবং যাদের রমযানের পরেও রোযা রাখার শক্তি নাই, দুধ-দানকারী মায়েরা এবং গর্ভবতী মহিলারা যাদের পক্ষে রোযা রাখা একেবারেই অসম্ভব তারা তাদের তৌফিক অনুযায়ী ফিদিয়া দিবে।

রোযা রাখার জন্য নিয়্যত আবশ্যক। আর এটিও জরুরী, যে ব্যক্তি রোযা রাখবে তার রোযা রাখার জন্য নিয়্যত করা উচিত। নবী করীম (সা.) বলেছেন, সুবেহ্ সাদেকের আগে যে রোযার নিয়্যত না করবে তার কোন রোযা নাই। নিয়্যত করার জন্য কোন বিশেষ বাক্য মুখে উচ্চারণ করা আবশ্যক নয়। নিয়্যত মূলত হৃদয়ে ইচ্ছা পোষনেরই নাম।

## সেহরী ও ইফতারের সময় ঃ

আল্লাহ্ তা'লা যেখানে মুসলমানদের জন্য রোযা রাখার তাগিদ করেছেন সেখানে এর সময়ও অবগত করেছেন। পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারা ১৮৮ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'আর তোমরা খাও এবং পান কর যতক্ষণ তোমাদের কাছে ভোরের সাদা রেখা (রাতের) কালো রেখা থেকে সুস্পষ্ট না হয়। অতঃপর রাত ( নেমে আসা) পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর।'

বর্তমান যুগে ফজরের সময় অর্থাৎ সুবেহ সাদেক এর সময় ঘড়ির মাধ্যমে এভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব যে, সূর্য উদিত হওয়ার এক ঘন্টা বাইশ মিনিট আগে রোযা শুরু (সেহেরী) করার সময়। অর্থাৎ সূর্য উদিত হওয়ার এক ঘন্টা বাইশ মিনিট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়কালে রোযা রাখার জন্য সেহেরী খান। আর যখন সূর্য উদিত হওয়ার এক ঘন্টা বাইশ মিনিট সময় অবশিষ্ট থাকে তখন সেহরী খাবার বন্ধ করে দিন। আর সূর্য অস্তমিত হওয়ার সাথে সাথেই ইফতার করুন। ইফতার কোন বিশেষ কারণ ছাড়া দেরিতে করা উচিত নয়। ইফতার দেরিতে করাকে ইসলাম পছন্দ করে না।

রোযা রাখার পূর্বে সেহরী খাওয়াও রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সুন্নত। এজন্য সুবহ্ সাদেক হওয়ার আগে রোযা রাখার জন্য খাবার খাওয়াকে সেহরী বলা হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) বলেন, সেহরী অবশ্যই খাবে, কেননা এতে বরকত রয়েছে। আর যখন মানুষ সারা দিন রোযা রাখার পর ইফতার করে তখন যেন দোয়ার মাধ্যমে ইফতার করে। রসূলুল্লাহ্ (সা.) ইফতারের সময় এ দোয়া পাঠ করতেন 'হে আল্লাহ্ ! আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য রোযা রেখেছি এবং তোমার দেয়া রিযিক থেকে ইফতার করছি' (আবু দাউদ)।

## রোযা ভঙ্গের কারণ ঃ

বিভিন্ন কারণে রোযা ভেঙ্গে যেতে পারে।

যেমন জেনে বুঝে খাবার খেলে রোযা ভেঙ্গে যায়। এভাবে শারিরিক সম্পর্ক করা, শিংগা ইত্যাদি লাগানো, টিকা দেওয়া এবং কেউ জেনে বুঝে বমি করলে রোযা ভেঙ্গে যায়। হাদীসে এসেছে, যদি কোন রোযাদার ব্যক্তি নিজের অজান্তে বমি হয় তাহলে তার রোযা ভাঙ্গবে না এবং এতে তার রোযা কাযাও হবে না। কিন্তু যদি জেনে বুঝে বমি করে তাহলে তার রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং কাযা হবে অর্থাৎ পুনরায় রোযা রাখতে হবে।

যদি কোন রোযাদার ভুল করে খাবার খায় তাহলে রোযা ভাঙ্গবে না। যদি কারো এমনিতেই কোন জিনিষ পেটে চলে যায় যেমনঃ ধোঁয়া, ধুলা-বালি, ওযু করার সময় সামান্য পানি পেটে চলে গেলে রোযা ভাঙ্গে না। এভাবে কানে পানি গেলে, নাক ফুটালে, দাত দিয়ে সামান্য রক্ত বের হলে, দাত ব্রাশ করলে, সুগন্ধি লাগালে বা ঘ্রাণ নিলে, দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় স্বপ্নদোষ হলে, মাথায় বা দাড়িতে তেল লাগালে রোযা ভাঙ্গে না।

## বাহানা ছাড়া রোযা রাখা :

পবিত্র রমযান মাসে যে সমস্ত লোক কোন বাহানা ছাড়া রোযা রাখে না অথবা সামান্য সামান্য বিষয়ে বাহানা করে রোযা ছেড়ে দেয় তাদের সম্পর্কে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি কোন বাহানা ছাড়াই রমযানের একটি রোযাকে ছেড়ে দেয় সে যদি পরবর্তীতে এই একটি রোযার পরিবর্তে সারা জীবন রোযা রাখে তবুও এর ঘাটতি পূর্ণ হবে না।"

পবিত্র রমযান মাস এজন্য আসে, যেন মানুষ খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জন করতে পারে। পাপ থেকে বিরত থাকা, আধ্যাত্মিক শক্তি এবং ধৈর্য সৃষ্টি করার জন্য। গরীবদের খেয়াল রাখা, অভাবীদের অভাব পূরণ করা এবং নিজের নাফসের আত্মশুদ্ধির জন্য। সুতরাং এটি হলো পবিত্র ও বরকতময় রমযানের বাণী। ঐ সকল লোক ধন্য যারা এই বাণীকে বুঝে এবং খোদা তা'লার হুকুম অনুযায়ী চলে। কানযুল উম্মালের এক হাদীসে এসেছে, নবী করীম (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি রমযান মাসে জেনে বুঝে পাপ করে বা কোন মু'মিনকে নিয়ে কুৎসা রটনা করে, কোন নেশাদ্রব্য ব্যাবহার করে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তার সমস্ত আমলকে নষ্ট করে দিবেন। সুতরাং তোমরা পবিত্র রমযান মাসে খোদা ভীতি অবলম্বন কর। কেননা এটি আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র মাস।"

রমযান মাসে তোমরা কখনোই কোন হারাম কাজ করবে না। কারো অধিকার হরন করবে না বরং ঝগড়া ঝাটি থেকে বিরত থাকার জন্য নিজের অধিকারও ত্যাগ করবে। যদি মানুষ এই বাণীকে বুঝে তাহলে তার রোযা প্রকৃত রোযা হবে এবং সে ঐ সমস্ত সুসংবাদের উত্তরাধিকারী হবে যা খোদা তা'লার সেই প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) বলেছেন। এটা আমাদের সৌভাগ্য যে, আল্লাহ্ তা'লার ফযলে পবিত্র রমযান আমাদের জীবনে এসেছে। মহানবী (সা.) এই মোবারক মাসকে "শাহরে মোবারক" আখ্যা দিয়েছেন। আর এই কারণে এই মাসকে 'সাইয়্যেদুশ সুহুর" অর্থাৎ সমস্ত মাসের নেতাও বলেছেন। এই মোবারক মাসে মানুষের প্রত্যেকটি আমল দশগুণ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত প্রতিদান পেয়ে থাকে। এটা এতই কল্যাণমন্ডিত ও রহমত ও মাগফেরাতের মাস যেভাবে নবী করীম (সা.) বলেছেন, ***"ইন্নাল জান্নাতা লা তাদাইয়্যানু মিনাল হাওলে ইলাল হাওলে শাহরে রামাদানা"*** অর্থাৎ জান্নাত এক বছর থেকে আরেক বছরে রমযানকে স্বাগত জানানোর জন্য সাজ-সজ্জা করতে থাকে। কেননা এই মাসে জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়।

এই পবিত্র মাসে মানুষ অধিক পরিমাণ কল্যাণ লাভে উপকৃত হতে পারে। এই মাস থেকে উপকৃত হতে হলে-

১) এই পবিত্র মাসে সকলে যেন বা-জামাত নামায আদায় করি। কেননা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বা-জামাত নামায প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বার বার জামা'তের সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

২) গভীর রাতে উঠে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করা। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন আমাদের জামা'তের প্রত্যেকের উচিত গভীর রাতে উঠে অবশ্যই যেন তাহাজ্জুদ নামায আদায় করে। বেশী না হলেও অন্ততপক্ষে দুই রাকাত যেন পড়ে নেয়। কেননা এতে তার দোয়া করার একটি সুযোগ হবে। আর ঐ সময়ের দোয়াতে একটি বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি হয়। কেননা তখন হৃদয়ের গভীর থেকে দোয়া উৎসারিত হয়।

৩) পবিত্র রমযান মাসে তারাবীহ নামাযের ব্যবস্থা রয়েছে তাই বন্ধুদের উচিত তারাবীহ নামাযে শামিল হওয়া।

৪) বেশি বেশি এই পবিত্র মাসে কুরআন তেলওয়াত করা। কেননা এই পবিত্র মাসের সাথে কুরআন করীমের একটি গভীর সর্ম্পক রয়েছে। এই বরকতপূর্ণ দিনগুলিতে পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়া শুরু হয়েছে। সবাই যেন এই কল্যাণমন্ডিত মাসে বেশি বেশি কুরআন তেলওয়াত করে এবং গভীর মনোযোগের সাথে পড়ে। নবী করীম (সা.) এর সুন্নত অনুযায়ী দু'বার খতম করা উচিত। যদি এটিও সম্ভব না হয় তাহলে অন্ততপক্ষে একবার খতম করে।

৫) বেশি বেশি দোয়া করা উচিত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, পবিত্র রমযান মাস দোয়ার মাস। (আল হাকাম, ১৪ জানুয়ারি ১৯০১)। এই কারণেই রোযা ও দোয়ার সাথে একটি গভীর সর্ম্পক রয়েছে, এজন্যই আল্লাহ্ তালা বলেন, 'আমার বান্দাদের বলে দাও! আমি খুবই নিকটে এবং আমি দোয়া কবুল করি' (সূরা বাকারা-১৮৭)।

হযরত আমিরুল মুমিনীন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) যখন ২০০৩ সনে খিলাফতের আসনে সমাসীন হন তখন তিনিও তাঁর সর্বপ্রথম তাহরীক করেন, ***"দোয়া করুন, দোয়া করুন, অনেক বেশি দোয়া করুন।"***

৬) পবিত্র রমযান মাসে বেশি বেশি যিকরে এলাহী, তওবা, ইসতেগফার এবং দুরূদ শরীফ বেশি বেশি পাঠ করা উচিত। মহানবী (সা.) বলেন, 'যিকরে এলাহী করা এবং যিকরে এলাহী না করা ব্যক্তির উদাহরণ হচ্ছে জীবিত এবং মৃত ব্যক্তির ন্যায়' (বুখারী, কিতাবুদ দাওয়াত)।

আরেকটি বিষয় হল, নবী করীম (সা.) দিনে ৭০ বারের অধিক দুরূদ শরীফ পাঠ করতেন। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত, এই পবিত্র মাসে বেশি বেশি যিকরে এলাহী, তওবা, ইস্তেগফার এবং দরূদ শরীফ পাঠে রত থাকা। এছাড়া এই পবিত্র মাসে ফিতরানা, ফিদিয়া আদায় করা ছাড়াও বেশি বেশি সদকা-খয়রাত করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে এই পবিত্র রমযান মাসের রহমত, মাগফেরাত এবং নাজাতের দশক থেকে কল্যাণমন্ডিত হয়ে খোদা তা'লার একনিষ্ঠ সালেহ বান্দারূপে গড়ে তুলুন এবং বেশি বেশি কল্যাণ অর্জন করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

# রমযান
## আধ্যাত্মিক জগতের বসন্ত

*মওলানা শেখ মোস্তাফিজুর রহমান*
*শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ*

বাহ্যিক ঋতুর মাঝে যেমন বসন্ত আছে ঠিক তেমনি আধ্যাত্মিক জগতের বসন্ত হলো রমযান। আমরা কতই সৌভাগ্যবান, আমাদের জীবনে বছর ঘুরে সে বসন্ত আবার ফিরে এসেছে। অন্যথায় এমন অনেকে আছেন যারা এ বসন্ত আসার পূর্বেই আমাদের থেকে গত হয়ে গেছেন। তাই আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত যে, সেই দিন আমরা আবার দেখতে পেয়েছি এবং ইতোমধ্যে কয়েকটি দিন অতিবাহিতও করেছি, আলহামদুলিল্লাহ্। আমাদের প্রিয় নবী করীম (সা.) বলেন, শোন শোন! তোমাদের কাছে রমযান মাস আগত। এ মাস বরকত মন্ডিত মাস যে মাসে রোযা রাখা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য আবশ্যক করেছেন। এ মাসে জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় আর বিদ্রোহী শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়। এছাড়া এ মাসে এমন একটি বরকতময় রাত আছে, যে রাত হাজার রাত অপেক্ষা উত্তম, যে এর বরকত থেকে বঞ্চিত থাকল সে অসফল হলো। (নিসায়ী, কিতাবুস সওম)

রমযান এমন এক প্রিয় মাস যে মাসের আগমনে উর্ধ্বলোকেও প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয় এবং জান্নাত সুসজ্জিত করা হয়। হুযূর (সা.) বলেন, রমযানের শুভাগমন উপলক্ষ্যে সমস্ত বছর জুড়ে জান্নাতকে সুসজ্জিত করা হয়। আর যখন রমযানের আগমন হয় তখন জান্নাত বলে, হে খোদা! এ মাসে তুমি তোমার বিশেষ বান্দাদেরকে আমার জন্য মনোনীত করো। (বায়হাকী, সা'বুল ইমান)।

হুযূর (সা.) আরেক স্থলে বলেন, রমযানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখো কেননা এটি আল্লাহ্ তা'লার মাস যা অতি বরকতমন্ডিত এবং অতি উচ্চ পর্যায়ের। তিনি তোমাদের জন্য ঐ এগার মাস ছেড়ে দিয়েছেন যে মাসগুলোতে তোমরা (নিশ্চিন্তে) পানাহার করে থাকে। এবং সকল প্রকার স্বাদ আশ্বাদন করে থাকো কিন্তু তিনি নিজের জন্য একটি মাস মনোনীত করেছেন। (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)।

রমযানুল মুবারককে সাইয়্যেদুশ শুহুর অর্থাৎ সকল মাসের সরদারও বলা হয়েছে। এ মাস অগনিত বরকতের মাস। চৌদ্দশত বছর পূর্ব থেকে কোটি কোটি পুণ্যবান আত্মা এ মাস লাভ করে এসেছে আর বর্তমানেও কোটি কোটি পবিত্রাত্মা এ মাস থেকে লাভবান হচ্ছে। এ দিনগুলোতে নিষ্ঠাবান রোযাদারদের দোয়া কবুলিয়্যতের মর্যাদা লাভ করে। তাদের প্রতি আধ্যাত্মিক নূর বর্ষিত হয়। তারা কাশফ বা দিব্যদর্শন, সত্য স্বপ্ন এমনকি ইলহামের কল্যাণও লাভ করতে সক্ষম হয়।

সাইয়্যেদেনা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, বিশেষ কথা হলো, রমযান একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসের নাম এবং যে ব্যক্তি নিজ হৃদয়ে ইসলাম এবং ইমানের প্রতি সম্মান রাখে সে ব্যক্তি এ মাস আগমনের সাথে সাথে নিজ হৃদয়ে এক বিশেষ গতির সঞ্চার করে এবং নিজ দেহে এক বিশেষ কম্পন অনুভব ব্যতিরেকে থাকতেই পারে না। হুযূর (সা.)-এর পর কত-শত বছর তার এবং আমাদের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করতে থাকুক না কেন, এবং আমাদের মাঝে অন্তরায় হোক না কেন, কিন্তু যখন রমযান মাস আসে তখন মনে হয় ঐ সকল যুগ এবং বছরসমূহকে এ মাস গুটিয়ে ছোট করে দিয়েছে এবং আমরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকটবর্তী হয়ে গেছি। কেবল মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকটেই নয় বরং যেহেতু কুরআন খোদা তা'লার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, তাই এটি মনে হয় যে, এ সকল দূরত্বকে রমযান সংকীর্ণ করে দিয়ে আমাদেরকে খোদা তা'লার নিকটবর্তী করে দিয়েছে। আর মানুষের সাথে খোদা তা'লার যে দূরত্ব হয়ে থাকে, সেই দূরত্ব যা এক সৃষ্ট জীবের তার প্রভূর সাথে হয়ে থাকে, সেই দূরত্ব যা এক দূর্বল এবং অযোগ্য সত্ত্বার পৃথিবী এবং আকাশসমূহের সৃষ্টিকারীর সাথে হয়ে থাকে তা এভাবে সংকীর্ণ ও বিলীন হয়ে যায়, যেভাবে সূর্যের আলোয় রাতের আধার দূরীভূত হয়। এটি সেই অবস্থা যার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন, (ওয়া ইযা সাআলাকা ইবাদি আন্নি ফাইন্নি ক্বারিব), যখন রমযান মাস আগমন করে আর আমার বান্দা তোমার কাছে আমার ব্যাপারে প্রশ্ন করে যে, আমাকে তারা কীভাবে লাভ করতে পারে, তখন তুমি তাদেরকে বলে দাও, রমযান এবং খোদা তা'লার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। এটি সেই মাস, যে মাসে খোদা তার বান্দাদের জন্য প্রকাশিত হন এবং তিনি আশা করেন, নিজ বান্দাদেরকে তিনি নিজের দিকে টেনে আনবেন। এ হাবলুল্লাহ অর্থাৎ খোদার সেই রশি যার একটি প্রান্ত খোদা তা'লার হাতে এবং অপর প্রান্ত বান্দার হাতে। এখন এটি বান্দাদের কাজ, তারা যেন এ রশি বেয়ে খোদা তা'লা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। (তফসিরে কবির, সূরা বাক্বারার ১৮৬ আয়াতের তফসিরে)

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) রমযানের এ

**রমযানের শুভাগমন উপলক্ষ্যে সমস্ত বছর জুড়ে জান্নাতকে সুসজ্জিত করা হয়। আর যখন রমযানের আগমন হয় তখন জান্নাত বলে, হে খোদা! এ মাসে তুমি তোমার বিশেষ বান্দাদেরকে আমার জন্য মনোনীত করো।**

দিনগুলোর ব্যাপারে বলেন, আমার অবস্থা তো এরূপ যে, মৃত্যুর নিকটবর্তী হলেই তবে রোযা পরিত্যাগ করি। আমার মানস রোযা পরিত্যাগ করতে চায় না। এগুলো বরকতমন্ডিত দিন এবং আল্লাহ্ তা'লার দয়া ও কৃপা অবতীর্ণ হবার দিন। (আলহাকাম, ২৪ জানুয়ারী ১৯০১ পৃঃ ৫)।

## রমযানে হুযূর (সা.)-এর ইবাদতঃ

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেনঃ রমযানে তিনি (সা.) কোমর বেধে নিতেন এবং পূর্ণ চেষ্টা-প্রচেষ্টা করতেন।

হুযূর (সা.)-এর ইবাদতের অবস্থার বর্ণনা এভাবেও এসেছে যে, রাতে ইবাদতের সময় তাঁর (সা.) বক্ষ খোদা তা'লার সমীপে কান্নাবনত হতো, হৃদয় বিগলিত হতো এবং বুকের মাঝে এমন কান্নার শব্দ শোনা যেত যেভাবে হাড়িতে পানি টগবগ করলে শব্দ হয়। (শামায়েলে তিরমিযি)

হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, হুযূর (সা.) রমযানের রাতে কিভাবে ঈবাদত করতেন? তিনি বলেন, হুযূর (সা.) রমযান মাসে এবং রমযান ছাড়াও অন্যান্য দিনগুলোতে এগারো রাকাতের বেশি নামায পড়তেন না। তিনি (সা.) চার রাকাত নামায আদায় করতেন এবং তোমরা সেই দীর্ঘ নামাযের সৌন্দর্যের ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞেস করো না (অর্থাৎ হুযূর সা. এর নামাযের সৌন্দর্য বর্ণনা করার ভাষা আমার কাছে নেই) এরপর এমনি দীর্ঘ এবং অতি চমৎকার চার রাকাত নামায আরো আদায় করতেন আর অবশেষে তিন রাকাত বেতের নামায আদায় করতেন। (বুখারী, কিতাবুস সওম, বাব ফাযলুম মান কামা রামাযান)।

## রমযানের সর্বোত্তম ফল হল খোদার সাথে সাক্ষাৎঃ

রোযা পালনকারী রোযার কারনে খোদা তা'লাকে লাভ করে। খোদার সাক্ষাৎ এবং খোদার দিদার লাভ হয়। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হুযূর (সা.) বলেছেনঃ তোমাদের খোদা বলেছেনঃ প্রত্যেক নেকীর প্রতিদান দশ গুণ থেকে সাত শত গুণ পর্যন্ত আর রোযার ইবাদত বিশেষ ভাবে আমার জন্য আর আমি স্বয়ং তার প্রতিদান দিব অথবা আমি স্বয়ং এর প্রতিদান হব। (তিরমিযি, আবওয়াবুস সাওম)।

এমনি ভাবে তিনি (সা.) বলেছেন, রোযাদারের জন্য দু'টি আনন্দ নির্ধারিত, একটি আনন্দ সে তখনি লাভ করে যখন সে ইফতার করে আর দ্বিতীয় বার সে তখনি আনন্দিত হবে যখন সে রোযার প্রতিদানে তার প্রভূর সাক্ষাৎ লাভ করবে। (বুখারী, কিতাবুস সওম)।

সাইয়্যেদেনা হযরত আমিরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) রমযানের ফজিলতের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেনঃ রমযানের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য এবং সবচেয়ে বড় প্রতিদান হল খোদা লাভ হয়। অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন (ওয়া ইযা সাআলাকা ইবাদি আন্নি ফাইন্নি ক্বারিব) হুযূর (সা.) কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, হে রসূল! যদিও রসূল (সা.)-এর নাম নেই তবুও তাঁকেই উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। (ওয়া ইযা সাআলাকা ইবাদি আন্নি) যখন আমার বান্দা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, (আন্নি) আমার ব্যাপারে (ফাইন্নি ক্বারিব) তখন আমি নিকটেই থাকি। এ দোয়ার মাঝে যেদিকে ইশারা করা হয়েছে এখানে জাগতিক কোন প্রয়োজন পূর্ণ করার কথা বলা হয় নি। (ওয়া ইযা সাআলাকা ইবাদি আন্নি) অর্থাৎ যখন আমার বান্দা আমাকে খুঁজে ফেরে, আর আমাকে চায় এবং তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, আমরা কিভাবে নিজ প্রভূকে পেতে পারি তখন তিনি এ কথা বলেন নি যে, ফাক্বুল ইন্নি ক্বারিব, তুমি তাদেরকে বলে দাও যে ইন্নাল্লাহা ক্বারিব। আল্লাহ নিকটে অথাবা আমি নিকটে। দ্রুত উত্তর (ফাইন্নি ক্বারিব) নিকটবর্তী যে হয় অনেক সময় সে অন্যদের উদ্ধৃতি দেয় না, অন্য কাউকে এ কথা বলবে না যে তাকে বলে দাও যে, আমি নিকটে। তাই এর মাঝে প্রশ্নকারীর নিয়্যতের একনিষ্ঠতার উল্লেখ রয়েছে। যদি কেউ সময়মত আমাকে চায় তখন হে রসূল! যখনি তারা তোমার কাছে জিজ্ঞেস করবে তা আমি শুনতে পাই। আমাকে বলার জন্য তোমার মাধ্যম প্রয়োজন নেই। (খুতবা জুমুআ, ২৬ ডিসেম্বর ১৯৯৭)।

## রোযা ফেরেশতাদের দোয়াসমূহ এবং এস্তেগফার সমূহ লাভ করার মাধ্যম

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন হুযূর (সা.) বলেছেন, যখন কেউ রমযানের প্রথম দিন রোযা রাখে তখন তার পূর্বেকার

সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। এমনিভাবে রমযান মাসের সমস্ত দিন চলতে থাকে এবং প্রতি দিন তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা সকালের নামায থেকে শুরু করে তাদের পর্দার অন্তরালে যাবার আগ পর্যন্ত তার ক্ষমার জন্য দোয়া করতে থাকে। (কানযুল উম্মাল, কিতাবুস সওম)।

একবার হুযূর (সা.) বলেন, ফেরেশতা রোযাদারের জন্য দিন-রাত এস্তেগফার করতে থাকে। (মাযমাউয যাওয়ায়েদ)।

## গুনাহ থেকে পবিত্র হবার উত্তম সূযোগঃ

হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ (রা.) বর্ণনা করেন, হুযূর (সা.) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি রমযান মাসে ইমানের সাথে সোয়াব এবং এখলাসের সাথে ইবাদাত করে সে নিজ গুনাহ থেকে এভাবে পবিত্র হয়ে যায় যেভাবে সেদিন সে তার মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম লাভ করেছিল।

হুযূর (সা.) বলেন, রোযা গুনাহসমূহকে একেবারে ধ্বংশ করে দেয়। নাযার বিন শায়বান (রা.) বর্ণনা করেন, আমি আবু সালমা বিন আব্দুর রহমান কে বললাম, আপনি আমাকে এমন কোন কথা বলুন যা আপনি আপনার পিতা থেকে শুনেছেন আর তিনি রমযান মাস সম্পর্কে হুযূর (সা.)-এর কাছ থেকে শুনেছেন। নাযার বিন শায়বান (রা.) বলেন, আমি আবু সালমা বিন আব্দুর রহমান কে বলেছি। এমন ধারনা তার মাথায় কেন এসেছে । মনে হয় এই রেওয়ায়েত সর্বসাধারনের মাঝে প্রচলিত ছিল এবং লোকমুখে তিনি শুনে থাকবেন আর তিনি চাইলেন যে, আমার মুখ থেকে স্বয়ং শুনবেন। আবু সালমা বিন আব্দুর রহমান বলেন, হা, আমার কাছে আমার পিতা বর্ণনা করেছেন যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন যে, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'লা রমযানে রোযা রাখা তোমাদের জন্য ফরয করেছেন আর আমি তোমাদের জন্য এর কেয়াম জারি করে দিয়েছি অতএব যে কেউ ইমানের অবস্থায় পুণ্যলাভের নিয়তে রোযা রাখবে সে গুনাহ থেকে এভাবে বেরিয়ে আসে যেভাবে তার মা তাকে জন্ম দিয়েছে।

## রোযা জান্নাত লাভের মাধ্যম

একবার হুযূর (সা.) বলেন, এটি ধৈর্যের মাস এবং ধৈর্যের প্রতিদান হল জান্নাত। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেনঃ যদি বান্দা এক দিনের রোযা নিজ খুশি এবং সন্তুষ্টি এবং মনোযোগী হয়ে রাখে এরপর তাকে যদি পৃথিবী সমান স্বর্ণ দেয়া হয় তবুও তা হিসাবের দিন তার পুণ্যের বরাবর হবে না। (আততারগিব ওয়াত তারহিব)।

হযরত আবু আমামা বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কছে আরয করলাম যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাকে এমন কোন কাজ বলে দিন যার মাধ্যমে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো। তখন হুযূর (সা.) বললেন, আবশ্যকীয় কর্ম হিসেবে রোযা রাখো কেননা এটি সেই আমল যার কোন উপমা বা পরিবর্তন নেই। (আত তারগিব ওয়াত তারহিব, নিসাঈ, কিতাবুস সওম)।

## রোযা আগুন থেকে রক্ষা পাবার মাধ্যম

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, হুযূর (সা.) বলেছেনঃ যে বান্দা খোদার পথে এক দিন রোযা রাখে আল্লাহ্ তা'লা তার চেহারা থেকে আগুনকে দূরে সরিয়ে দেন। (সহী মুসলিম ও ইবনে মাযা)

অপর একটি বর্ণনায় পাওয়া যায়, খোদার জন্য এক দিনের রোযা পালনকারী থেকে জাহান্নাম শত বছর দূরত্বে পাঠিয়ে দেয়া হয়। (নিসায়ী কিতাবুস সওম)

একবার হুযূর (সা.) বলেন, রোযা আগুন থেকে রক্ষা পাবার এক ঢাল স্বরূপ।

## ইবাদাতের তত্ত্বজ্ঞান প্রদানকারী মাস

হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) রমযান মাসকে ইবাদতের দিক থেকে সকল মাসের তুলনা সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন এবং বলেছেনঃ যে ব্যক্তি রমযান মাসে ইমানী অবস্থায় এবং নিজেকে যাচাই-বাছাই করে রাতে উঠে ইবাদত করে সে তার গুনাহসমূহ থেকে এভাবে পবিত্র হয়ে যায় যেভাবে সেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল। (সুনানে নিসাঈ, কিতাবুস সওম)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) বলেন, রমযানুল মুবারক আপনাদেরকে ইবাদতের মুল তত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছে। যদি আপনারা নিজেরা না শিখে থাকেন তবে যারা শিখেছে তাদেরকে দেখেছেন নিশ্চয়? ব্যতিক্রম ছাড়া কোন এমন একটি ঘর পাওয়া যাবে না যে ঘরে কেউ রমযানে ইবাদত করছে না বা কেউ রোযা রাখছে না। যদি এমনটি হয়ে থাকে তবে দূরে নয় বরং আজ এই জুমাতুল বিদায় উপস্থিত হয় নি। তাই না তাদের কাছে আমার বাণী পৌঁছাচ্ছে বা আমি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছি না। আমি তাদের সাথে কথা বলছি, যাদের বক্ষে ঈমানের জলন্ত অঙ্গার অবশ্যই আছে আর খোদা তা'লা এই অঙ্গারকে সর্বদা ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখেছেন। এটি তো আলোকিত জ্বলন্ত কয়লা ফলে একটি আশা তো করা যায়। তাই আমি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছি, যাদের হৃদয়ে এ আশার জ্বলন্ত কয়লা আলো ছড়াচ্ছে। এখনও যদি ছাইয়ের নিচে পড়ে থেকে থাকে তবুও ভিতরে থেকে কয়লা এখনও জ্বলছে এবং জীবিত আছে।

তাই এ দিক থেকে আমি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি, রমযানের এই বরকতসমূহের ফলে যে লোকেরা দিনে ইবাদত করতো এবং রাতে উঠতো না তাদেরকে রাতে ওঠা শিখিয়েছে। তাদেরকে খোদার দরবারে সেই আনুগত্য দান করেছে যা সাধারণ দিনগুলোতে তারা লাভ করতে পারতো না। রমযান গুনাহ্‌সমূহ থেকে রক্ষা পাবার এক বড় সূযোগ দান করে যা সময়ের দিক থেকে শর্তযুক্ত কিন্তু অবশ্যই তা লাভ হয়েছে। ঐ লোকেরা যারা নিজেদের বেদাত কাজ ছাড়তেই পারতো না অথবা পরিত্যাগ করার সামর্থ্য রাখতো না, সেহেরী থেকে ইফতার পর্যন্ত যে সীমাবদ্ধ সময় রয়েছে সে সময় তারা বাধ্য হয়, ঐ বাক্য সমূহ থেকে বিরত থাকে, রমযান এতে সাহায্য করে, রমযান আপনাদেরকে নেকীর কাজে চলার জন্য সেই লাঠির ব্যবস্থা করে দিয়েছে, যে লাঠিতে ভর করে আপনারা ধীরে ধীরে সামনে অগ্রসর হতে পারেন। (খুতবা জুমুআ, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭)

অতএব রোযার গুরুত্ব অনুধাবন করে আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদের সকলকে রোযা রাখার সৌভাগ্য দান করেন এবং এ বসন্ত আমাদের কাছ থেক যেন কখনই হারিয়ে না যায়। সর্বদা যেন রমযানের বসন্ত আমাদের জীবনের বাগানে সজীব-সুগন্ধি ফুল সৃষ্টি করে, আমীন।

(জহুর আহমদ বশির এর রচনা অবলম্বনে)

# রোযা খোদা তা'লার জন্যই আর তিনিই এর প্রতিদান

*মৌলবী এনামুল হক রনী*

রোযা শব্দটি ফারসী শব্দ। আরবী সাওম শব্দ থেকে রোযা অর্থ করা হয়। সাওম শব্দের আভিধানিক অর্থ অবিরাম চেষ্টা করা, আত্মসংযম করা, বিরত থাকা, ধৈর্যসহ লেগে থাকা ইত্যাদি।

ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইবাদতের নিয়্যত করে সুবেহ সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকার নাম হলো সাওম বা রোযা।

ইসলামের মূল স্তম্ভের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হলো রোযা। প্রত্যেক বয়োঃপ্রাপ্ত বুদ্ধিমান নর-নারী, সুস্থ ও মুকিমের জন্য রোযা রাখা আল্লাহ্ পাক ফরজ করেছেন।

পবিত্র কালামে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেনঃ 'হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য সেভাবে রোযা রাখা বিধিবদ্ধ করা হলো যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার' (সূরা বাকারা :১৮৪)। এই আয়াতে রোযা ফরজ এই নির্দেশ দান করেছেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে রোযা হলো এমনই এক সার্বজনীন ইবাদত যা একজন রোযাদারকে হৃদয়ের পবিত্রতার মাধ্যমে চিন্তার বিশুদ্ধতা দান করে থাকেন। এই রোযা পালনের মাধ্যমে ইবাদতের যাবতীয় শিক্ষার সন্নিবেশের কারণে তাক্ওয়ার মাধ্যমে হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়। যার ফলে দুনিয়াবী যত পাপ পঙ্কিলতা আছে ক্রমান্বয়ে বিরত থেকে পুণ্যের পথে পা বাড়াতে থাকে। এক সময় নিষ্পাপ সদ্যজাত শিশুতুল্য জীবন লাভ করে।

মহানবী (সা.) বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে ও সওয়াবের আশায় রমযানে রোযা রাখে তাঁর পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে' (বুখারী ও মুসলিম)।

রমযান মাসের পবিত্রতা এত ব্যাপক যে, জান্নাতের দরজা খোলা থাকে। হাদীস শরীফে হুযূর পাক (সা.) বলেছেন : যখন রমাযান মাস আসে জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং শয়তানদেরকে আবদ্ধ করে দেয়া হয়। (বুখারী ও মুসলিম) এর অর্থ রমযানে জান্নাত লাভের বহু সুযোগ সৃষ্টি হয়। অনেক ইবাদতের সমষ্টি মিলে জান্নাত লাভ করা সহজতর হয়।

রোযা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেনঃ "নিজেদের রোযা খোদার জন্য সততার সাথে পূর্ণ কর....। (কিশতিয়ে নূহ্ ৩১ পৃঃ) তৃতীয় বিষয়, যাহা ইসলামের মূল ভিত্তি, তাহা হলো রোযা। রোযার প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে মানুষ অনবহিত। প্রকৃত কথা এই যে, যে দেশে কেউ যায় নাই এবং যে জগৎ সম্পর্কে সে অবহিত নয় সে ইহার অবস্থা কি বর্ণনা করবে? রোযা কেবল ইহা নহে যে, মানুষ এই দিনে ক্ষুধা ও পিপাসার্ত থাকে। বরং ইহার একটি তাৎপর্য ও ইহার একটি প্রভাব আছে যা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানা যায়। মানুষের প্রকৃতিতে ইহা আছে যে, সে যত কম খায় ততই তার আত্মা পবিত্র হয় এবং কাশফী শক্তি বৃদ্ধিলাভ করে। ...সমস্ত জীবনের গুনাহ থেকে মুক্তি পেতে রমযানের রোযার গুরাত্মারোপ করা হয়েছে। একজন তাকওয়াশীল মানুষের জন্য এর চেয়ে আর লোভনীয় ইবাদত আর কি হতে পারে ?

একটি বিখ্যাত বর্ণনায় হাদীসে কুদসীতে মহানবী (সা.) বলেছেনঃ মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেছেন, 'বনী আদমের প্রত্যেকটি আমল তার নিজের জন্য, রোযা ছাড়া। কারণ তা আমার জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান। আর রোযা হচ্ছে ঢাল। কাজেই তোমাদের কেউ যখন রোযা রাখে, সে যেন বাজে কথা না বলে, চেঁচামেঁচি না করে, যদি কেউ তাকে গালি দেয় বা তার সাথে ঝগড়া করে তাহলে তার বলা উচিত, আমি রোযাদার। যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, তাঁর কসম, রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র কাছে মিশকের চাইতেও সুগন্ধযুক্ত। রোযাদারের দু'টি আনন্দ, যা সে লাভ করবে। একটি হচ্ছে, সে ইফতারের সময় খুশী হয়। আর দ্বিতীয় আনন্দটি সে লাভ করবে যখন সে তার রবের সাথে সাক্ষাত করবে, তখন সে তার রোযার কারণে আনন্দিত হবে' (বুখারী ও মুসলিম)।

এই হাদীস থেকে আল্লাহ্‌র জন্য খাস ইবাদত রোযা এবং রোযার প্রতিদান উল্লেখ করা হয়েছে। এর তাৎপর্য হলো রোযার সমস্ত সওয়াব আল্লাহ্ স্বয়ং প্রদান করবেন বান্দার সামনে।

অপর একটি হাদীসে রোযাদারগণ আল্লাহ্‌র কাছে কত বেশি সম্মানের অধিকারী তা বর্ণনা করা হয়েছে। মহানবী (সা.) বলেছেনঃ জান্নাতের একটি দরজা আছে যার নাম রাইয়ান। কিয়ামতের দিন এই দরজা দিয়ে একমাত্র রোযাদাররা প্রবেশ করবে। তারা ছাড়া আর কেউ এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।

**‘যে ব্যক্তি পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে ও সওয়াবের আশায় রমযানে রোযা রাখে তাঁর পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে’**

প্রত্যেকটি কাজের জন্য যেমন নিয়্যত করা জরুরী তেমনি রোযা রাখার জন্য নিয়্যত করাও দরকার। হযরত নবী করীম (সা.) বলেন : যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে রোযা রাখার নিয়্যত না করে, তার রোযা রাখা পূর্ণ হয় না। (তিরমিযী) এইজন্য রোযার নিয়্যত রাতে করে নিলেও চলে। হাদীস শরীফ থেকে রোযার নিয়্যতের দোয়া সম্বলিত বাক্য পাওয়া যায় না। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল মুসলেহ মাওউদ (রা.) একস্থানে বলেন: রোযার জন্য নিয়্যত করা জরুরী। নিয়্যত না করলে সওয়াব পাবে না। আর নিয়্যত হচ্ছে মনের ইচ্ছা বা অভিব্যক্তি।

রোযা শুরু করতে হয় সেহরী খেয়ে, অন্য কথায় রোযা শুরু করার জন্য যে খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করা হয় এটাকে সেহরী বলে। সুবেহ সাদিক এর সময় খাওয়া-পান করা শেষ করতে হয়। পবিত্র কুরআনের নির্দেশ হলো : “তোমরা খাও এবং পান কর যতক্ষণ তোমাদের কাছে ভোরের সাদা রেখা কালো রেখা থেকে সুস্পষ্ট না হয় (সূরা বাকারা : ১৮৮)। হাদীস শরীফে আছে তোমরা সেহরী খাও। কারণ সেহরীতে বরকত আছে। (বুখারী)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন: “সর্বদা রোযাদারের একথা দৃষ্টিতে রাখতে হবে যে, ক্ষুধার্ত থাকাই তার উদ্দেশ্য নয়। বরং তার উচিত সে খোদা তা’লার যিক্‌রে মগ্ন থাকবে যাতে দুনিয়া ত্যাগ করে আল্লাহ্ মুখী হওয়া যায়। (মলফুযাত, ৯ম খন্ড ১২৩ পৃষ্ঠা)

সারাদিন আল্লাহ্‌র নির্দেশে পানাহার ও প্রবৃত্তিকে দমন করে অবশেষে রাত্রির প্রারম্ভে ইফতারী করতে হয়। কুরআনের শিক্ষা হলো অত:পর রাত পর্যন্ত ইফতার পূর্ণ কর। (সূরা বাকারা : ১৮৮) হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে : ‘যখন রাত ঐ দিক (পূর্ব) থেকে আসে এবং ঐ দিক (পশ্চিম)-এ চলে যায় তখন রোযাদার ইফতার করে নেয়’ (বুখারী ও মুসলিম)। অর্থাৎ ইফতারের মাধ্যমে একটি রোযার পূর্ণতা লাভ হয়।

রোযা শেষ করা বা পূর্ণ করাকে ইফতার বলা হয়। ইফতার করার সময় যে দোয়া পাঠ করে ইফতার করতে হয় তা হলো :

***‘আল্লাহুম্মা লাকা সুমতু ওয়াবিকা আমানতু ওয়া আলা রিযকিকা আফতারতু’***

অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ্! তোমার উদ্দেশ্যে রোযা রেখেছি এবং তোমার প্রতি ঈমান রাখি এবং তোমার দেওয়া জিনিস দিয়ে ইফতার করছি। একথাগুলি বলে ইফতার করা হয়ে থাকে। ইফতারের সময় অল্প খাবার গ্রহণ স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।

রোযার মাস বা রমযান মাস একজন মু’মিনের জন্য ফল পাকার মাস তুল্য। যত খুশি ইবাদত করে দশ-দশগুণ করে সওয়াব লাভ করতে থাকে। রমযানুল মুবারকে বাজামাত নামায পড়া, রমযানে কুরআন পাঠ করা, দরসে কুরআনে অংশ নেয়া, তাহরীকে জাদীদ, ওয়াকফে জাদীদ চাঁদা আদায় করা, ফিতরানা-ফিদিয়া এবং যাকাত আদায় করা এছাড়া বেশি বেশি তৌফা বিনিময় করা ইত্যাদি।

এসব ইবাদতের মাধ্যমে একজন বান্দা তাঁর স্রষ্টার নৈকট্য লাভে সমর্থ হয়। আর খোদাকে একান্ত পাওয়ার বাসনায় এতেকাফে ধ্যানমগ্ন হয় লায়লাতুল কদরের সন্ধানে। এভাবে রমযানের সওদা আমাদের জন্য পবিত্রকরণের কারণ হয়ে থাকে।

আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে পবিত্র মাহে রমযানের অফুরন্ত কল্যাণ দানে ভূষিত করুন। আমীন।


IT ACADEMY

**৩য় তলা, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১**

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত, বাংলাদেশ-এর দারুত-তবলীগ কমপ্লেক্সে জামা’তের শিক্ষিত সদস্য/সদস্যাদের কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে একটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার (আই.টি একাডেমি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গত ৯ই ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে এটি উদ্বোধন করা হয়।

**আমাদের বিশেষত্বঃ**

১. দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত
২. প্রত্যেকে শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা কম্পিউটার
৩. ন্যুনতম কোর্স ফি
৪. মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ব্যবহার
৫. সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা
৬. প্রত্যেক ক্লাশের পূর্বে লেকচার শিট প্রদান
৭. ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা
৮. কোর্স শেষে সার্টিফিকেট প্রদান

**আমাদের কোর্স সমূহঃ**

1. MS Office with internet
2. Hardware Maintenance and Troubleshooting
3. Web page Design
4. Elementary English
5. Familiar with Office Etiquette & Manners

**ভর্তির যোগ্যতা ও ফিসঃ**

১. ন্যুনতম এস.এস.সি পাশ,
২. কোর্স বাবদ প্রদেয় ঃ ভর্তি ফি -১০০.০০ টাকা, কোর্স ফি -৫০০.০০ টাকা এবং সার্টিফিকেট ফি - ১০০.০০ টাকা। সর্বমোট ৭০০.০০ টাকা।

**বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুনঃ**

**সৈয়দ খালেদ হাসান**
ইন্সট্রাক্টর, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৫৫৮৩১৯৬২৬, ০১৭১২৫১২৪৬২
ই-মেইল ঃ itaamjb@gmail.com, khaleditacademy@gmail.com

**মোহাম্মদ ইউনুস আলী**
কায়েদ, মখোআ ঢাকা
ইনচার্জ, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭২৭৭৭৬৮৮৩
ই-মেইল ঃ mdyounus.ali@gmail.com

# হযরত মুহাম্মদ (সা.) খাতামান্ নবীঈন কেন?

*খন্দকার আজমল হক*

আল্লাহ্ পাক কুরআন মজীদে ইরশাদ করেছেন, "মা কানা মুহাম্মাদান আবা আহাদিম মির রিজালিকুম ওয়া লাকির রাসূলাল্লাহি ওয়া খাতামান নবীঈন। ওয়া কানাল্লাহু বি কুল্লি শায়ইন আলীম।" অর্থাৎ 'মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারও পিতা নন, কিন্তু সে আল্লাহ্‌র রসূল এবং নবীগণের মোহর আর আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী' (৩৩:৪১)।

আয়াতটিতে আল্লাহ্ তা'লা হযরত রসূল করীম (সা.)-কে খাতামান্ নবীঈন বলেছেন। যার অর্থ নিয়ে মতভেদ হবার কারণে মুসলিম আলেম ওলামাগণ বর্তমান যুগের যুগ ইমাম হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করতে দ্বিধায় পড়েছেন এবং অন্যদেরকেও তাঁর ওপর ঈমান আনতে বাধা প্রদান করছেন। হুযূর পাক (সা.)-কে কোন্ অর্থে খাতামান্ নবীঈন বলা হয়েছে তা আয়াতটি নাযেলের কারণ, এর অর্থ এবং আনসঙ্গিক হাদীস সমূহ পর্যালোচনা করলেই অনুধাবন করা যাবে।

প্রথমে আয়াতটি নাযেলের কারণ পর্যালোচনা করা যাক। বর্ণিত সূরার ৩৮নং আয়াতে হুযূর (সা.)-এর পালিত পুত্র হযরত যায়িদ বিন হারিস (রা.)-এর তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী হযরত যয়নব (রা.)-এর সাথে তাঁর (সা.) বিবাহের উল্লেখ করা হয়েছে, এ বিবাহের বৈধতা নিয়ে তার বিরুদ্ধবাদীগণ প্রশ্ন উত্থাপন করে বলে যে, তিনি পালিত পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করেছেন। অথচ সূরাটির প্রারম্ভেই ৫নং আয়াতে পালিত পুত্র যে প্রকৃত পুত্র নয় তার ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ্ পাক জানিয়ে দিয়েছেন যে, হযরত যায়িদ (রা.) হুযূর (সা.)-এর প্রকৃত পুত্র নন। একদিকে হযরত যায়িদ (রা.)-কে পুত্র না বলায় অন্যদিকে তাঁর কোন ঔরষজাত পুত্র জীবিত না থাকায় বিরুদ্ধবাদীরা তাঁকে অপুত্রক বলে প্রচার করতে থাকে। তৎকালীন আরবে যা বিদ্রূপাত্মক শব্দ বলে গণ্য করা হত। এজন্যই আয়াতটির মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা জানিয়ে দেন যে, হযরত রসূল পাক (সা.) কোন পুরুষের জাগতিক পিতা না হলেও আল্লাহ্‌র রসূল হবার কারণে বর্তমান ও ভবিষ্যতে আগমনকারী কোটি কোটি উম্মতের আধ্যাত্মিক পিতা। এর উল্লেখ সূরাটির ৭নং আয়াতে করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "এ নবী মু'মিনগণের জন্য তাদের প্রাণাপেক্ষা নিকটতর এবং তার পত্নীগণ তাদের মাতা।" নবীর পত্নীগণ উম্মতের মাতা হলে নবী যে তাদের পিতা হন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

রাসূলুল্লাহ্ বলার পরই বলা হয়েছে, 'ওয়া খাতামান্ নবীঈনও বটে। যার অর্থ রাসূল হবার কারণে তিনি যেমন সাধারণ উম্মতের পিতা, খাতামান্ নবীঈন হবার কারণে তিনি নবীদেরও পিতা। খাতামান্ নবীঈন বলায় তিনি কীভাবে নবীদের পিতা হলেন, খাতাম শব্দের ব্যবহার ও এর অর্থ বিশ্লেষণ করলেই তা' পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ভাষা সম্পর্কে যাদের জ্ঞান আছে তারা জানেন যে, কোন গুণবাচক শব্দের পর অন্য আর একটি গুণবাচক শব্দ ব্যবহৃত হলে দ্বিতীয়টি প্রথমটি অপেক্ষা অধিক মর্যাদাবোধক অর্থ বহন করে থাকে। যেমন, কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে যদি বলা হয় যে, সে ভাল লোক, এরপর অন্য কোন গুণবাচক শব্দ বলতে হলে অবশ্যই বলতে হবে, 'সে খুব ভাল লোক।' একই ভাবে বর্ণিত আয়াতে 'ওয়ালাকির রাসূলুল্লাহ্' বলার পর, ওয়া খাতামান্ নবীঈন' ব্যবহৃত হওয়া এটাই যে, 'রাসূলুল্লাহ্' এর চেয়ে অধিক মর্যাদা বহন করে তা সহজেই অনুমেয়।

আমরা জানি, যেকোন ভাষাতেই একটি শব্দ একাধিক অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতে ব্যবহৃত খাতামান্ শব্দটিরও আরবী অভিধানে চারটি অর্থ পাওয়া যায়।

যেমন (১) মোহর (২) আংটি (৩) মুকুট ও (৪) শেষ। এও জানা যায় যে, যখন *তা* অক্ষরে যবর থাকে তখন ইহা ইসমে আ'লা এবং ইহা যখন বহু বচন বাচক বিশেষ্যের পূর্বে বসে তখন তার অর্থ সব সময়ই শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকে। হাদীস শরীফে বা আরবী সাহিত্যে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। যেমন একটি হাদীস হতে জানা যায় যে, হযরত রসূল করীম (সা.) হযরত আলী (রা.)কে বলেছিলেন, "আনা খাতামুল আম্বিয়া ওয়া আনতা, ইয়া আলী খাতামুল আউলিয়া।" অর্থ: "আমি খাতামুল আম্বিয়া এবং তুমি খাতামুল আউলিয়া, হে আলী।" এ হাদীসটি তফসীরে শাফিতে বর্ণিত হয়েছে। অন্য একটি হাদীস হতে জানা যায় যে, হযরত রসূল করীম (সা.) তাঁর চাচা হযরত আব্বাস (রা.)-কে বলেছিলেন, "নবুওয়তে যেমন আমি খাতামান্ নবীঈন, হিযরতে আপনি তেমন খাতামুল মুহাজেরীন" (কঞ্জুল উম্মাল)। খাতামুল আউলিয়া-এর অর্থ যদি শেষ আউলিয়া হয় এবং খাতামুল মোহাজেরিন এর অর্থ যদি শেষ মোহাজির হয়, তবে হযরত আলী (রা.)-এর পর কি কোন ওলি হন নি বা

হযরত আব্বাস (রা.)-এর পর কি কোন মোহাজির হন নি? আরবী সাহিত্যে এরূপ অর্থে খাতামের বহু ব্যবহার দেখা যায়। যেমন এক কবির মৃত্যুতে অপর এক কবি লিখেছেন, "কবিদের খাতামের মৃত্যুতে কবিতা ব্যথিত হয়েছে" (হিমশাহ্)। এখানে খাতামের অর্থ যে শ্রেষ্ঠ, তা' সহজেই পর্যালোচনা করলে শ্রেষ্ঠ হবার মর্ম উপলব্ধি করা যাবে।

(ক) মোহর :- মোহর বা সীল দুই কাজে ব্যবহার হয়ে থাকে। (১) কোন জিনিসের গুরুত্ব প্রদানের বা তার গোপনীয়তা রক্ষার জন্য তাকে সীল গালা করে পাঠানো হয়ে থাকে। যেমন কোন চিঠির খাম বা প্যাকেট সীল গালা করে পাঠালে বুঝতে হবে যে ঐ খাম বা প্যাকেটটির ভিতর কোন মূল্যবান ও গোপনীয় দ্রব্য আছে যা মালিক ভিন্ন খোলা নিষেধ। (২) কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির পরিচয় প্রদানের জন্য তার নামের নীচে পদবীর সীল ব্যবহার করা হয়। সরকারী অফিস আদালতে ব্যবহৃত সীল এর উদাহরণ। অতএব মোহরের প্রথম অর্থ ধরলে খাতামান্ নবীঈনের অর্থ হবে নবীদের মোহর আর যেহেতু মোহর কোন মূল্যবান দ্রব্যের বা শ্রেষ্ঠার্থের প্রতীক, সুতরাং খাতামান্ নবীঈনের অর্থ হবে শ্রেষ্ঠ নবী।

২য় অর্থ ধরলে অর্থ হবে নবীদের সীল বা নবীদের পরিচয় প্রদানকারী নবী। হুযূর পাক (সা.) যে নবীদের পরিচয় প্রদানকারী ছিলেন, কুরআন পাকেই তার প্রমাণ মেলে। কুরআন পাক হতেই আমরা জানতে পারি যে, জগতের কোথায় কোন্ নবী এসেছিলেন। কুরআন পাকই আমাদের জানায় যে "প্রত্যেক উম্মতের জন্য রয়েছে রসূল।" অনুরূপ কুরআন পাক অনেক নবীকে ব্যক্তিগতভাবেও আমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। যেমন হযরত নূহ্ (আ.), হযরত ইব্রাহীম (আ.), হযরত মূসা (আ.) ইত্যাদি। আর যেহেতু কুরআন পাক হযরত রসূল করীম (সা.)-এর মাধ্যমে নাযেল হয়েছে সুতরাং রসূলে পাক (সা.) পূর্বের সকল নবীর সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থে সেই সকল ধর্মীয় নবীদের নাম থাকলেও অন্য কোন জাতির নবীদের নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। অতএব হুযূর পাক (সা.) না আসলে জগত নবীদের পরিচয় জানত না।

যাঁর মাধ্যমে জগতে নবীগণ পরিচিত হলেন, তাঁর সাথে নবীদের কি সম্পর্ক হতে পারে? এটা সকলেই জানেন যে, আরব দেশে কারও নাম বলতে গেলে তার পিতার নাম যুক্ত করে বলা হয়। যেমন হযরত আলী ইবনে আবু তালেব, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর, হযরত যায়েদ ইবনে হারিস ইত্যাদি। অর্থাৎ পিতার নামে পুত্র পরিচিত হয়ে থাকেন। অতএব হযরত নবী করীম (সা.)-এর মাধ্যমে যেহেতু নবীগণ জগতে পরিচিত হয়েছেন, সেহেতু তিনি নবীদের পিতা নন কি?

**হযরত রসূল পাক (সা.) কোন পুরুষের জাগতিক পিতা না হলেও আল্লাহ্‌র রসূল হবার কারণে বর্তমান ও ভবিষ্যতে আগমনকারী কোটি কোটি উম্মতের আধ্যাত্মিক পিতা।**

কুরআন পাক হতে আরও জানা যায় যে, হুযূর পাক (সা.) শুধু নবীদের পরিচয় প্রদানকারী নবীই নন, তিনি নবী গঠনকারী নবীও বটে। কারণ ভবিষ্যতে তাঁর ইতায়াত করে উম্মতে মুহাম্মদীয়াতে নবী আসতে পারে। (৪:৭০) যেহেতু সকল নবী তাঁর উম্মত হবেন এবং তাঁর ইতায়াতের কারণে হবেন, সুতরাং তিনি তাদের পিতা নন কি? আর যেহেতু তিনি তাদের পিতা এবং তাঁর কারণেই এ সকল নবীর সৃষ্টি তাই তিনি নবী গঠনকারী নবীও বটে।

অতএব খাতাম শব্দের অর্থ মোহর বা সীল হলে খাতামান্ নবীঈন-এর অর্থ হবে নবীদের শ্রেষ্ঠ বা শ্রেষ্ঠ নবী, নবীদের পরিচয় প্রদানকারী-নবী বা নবীদের পিতা এবং পিতা হবার কারণে তিনি নবী গঠনকারী নবীও বটে।

(খ) আংটি/মুকুট;- মানুষ তার সৌন্দর্য প্রকাশের বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের জন্য আংটি বা মুকুট পরিধান করে থাকে। সাধারণত: মেয়েরা এবং প্রভাবশালী ও অর্থবান ব্যক্তিগণ এক বা একাধিক আংটি পরিধান করে থাকে। আগের দিনে রাজা বাদশাগণ নিজেদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের জন্য মাথায় মুকুট পরিধান করতেন। অতএব আংটি বা মুকুট সৌন্দর্য শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক। সুতরাং খাতামের অর্থ আংটি বা মুকুট ধরলেও খাতামান্ নবীঈন-এর অর্থ শ্রেষ্ঠ নবীই হচ্ছে।

(গ) শেষ;- খাতাম শব্দের অর্থ শেষ শুধু তখনই হয়ে থাকে যখন খাতামান্ নবীঈনের অর্থ তাঁর ন্যায় এতবড় মর্যাদাবান নবী আর হবে না প্রকাশ করে থাকে। কোন কোন তফসীরকারক ও সাহিত্যিকদের লেখায়ও এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন ভারতীয় মুসলমানদের প্রখ্যাত আলেম মওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেব তাঁর রচিত কুরআনের তফসীরে আয়াত খাতামান্ নবীঈন এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, "একটি গাছ বড় হতে হতে এত বড় হয় যে তাঁর চেয়ে বড় আর কোন গাছ হতে পারে না। খাতামান্ নবীঈন এর অর্থও এরূপ"। মওলানা রূমী তাঁর গ্রন্থ মসনবীতে লিখেছেন, "দানশীলতায় তাঁর তুল্য কেউ হয়নি এবং হবেও না, এ কারণে তিনি খাতাম। শিল্পগুরুকে তুমি কি বলনা যে, শিল্প তোমাতে চরমত্ব লাভ করেছে"। অতএব 'খাতাম' শব্দের অর্থ শেষ ধরলেও তা শ্রেষ্ঠার্থেই ব্যবহার হয়ে থাকে।

সুতরাং দেখা গেল যে, খাতামের চারটি অর্থই একই সুতায় গাঁথা। প্রতিটি অর্থের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অর্থ করলেই সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। শুধু শেষ করলে কুরআনের অন্য যে সকল স্থানে নবী আসার কথা আছে, তা অস্বীকার করতে হবে। (৪:৭০, ৭:৩৬, ১১:১৮ ইত্যাদি)। এছাড়া আরও অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয় যে সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হচ্ছে। পক্ষান্তরে কুরআনের আর কোন আয়াত দ্বারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পরে 'আর কোন নবী আসবে না' প্রমাণ করতে পারা যাবে না। (চলবে)

# শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)

মাহমুদ আহমদ সুমন

(১৪তম কিস্তি)

গত সংখ্যায় উল্লেখিত আয়াতগুলিতে বলা হয়েছে যে,-

প্রথমত: যুদ্ধ হতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র ওয়াস্তেই। অর্থাৎ ব্যক্তিগত লোভ-লালসা, ব্যক্তিগত স্বার্থ, দেশ জয়ের বাসনা, নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা, ইত্যাদি কারণে যুদ্ধ করা যাবে না;

দ্বিতীয়ত: যুদ্ধ কেবল তারই বিরুদ্ধে করা যাবে, যে আক্রমণ করে প্রথমে;

তৃতীয়ত: তাদেরই বিরুদ্ধে তোমাদের যুদ্ধ করা বৈধ হবে, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে;

কিন্তু যারা-রীতিমাফিক বা নিয়মিত সৈন্য নয়, এবং কার্যত: যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী নয়, তাদেরকে হত্যা করা বা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৈধ নয়।

চতুর্থত: শত্রু প্রথমে আক্রমণ করলেও যুদ্ধকে সেই সীমার মধ্যেই রাখতে হবে, যে সীমা পর্যন্ত শত্রু যুদ্ধ করে। সেই সীমাকে বৃদ্ধি করার চেষ্টা চালানো যাবে না, না এলাকার দিক থেকে না অস্ত্র-সস্ত্রের দিক থেকে;

পঞ্চমত: যুদ্ধ হতে হবে কেবল নিয়মিত সৈনিকদের সঙ্গেই। শত্রুর এক বা দু'জন লোকের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া যাবে না;

ষষ্ঠত: যুদ্ধে এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে যে, ধর্মীয় উপাসনা, এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনে যেন কোন প্রকারের বাধা-বিপত্তির সৃষ্টি না হয়। শত্রু যদি এইরূপ কোন স্থানে যুদ্ধাবস্থার সৃষ্টি না করে যেখানে যুদ্ধ করলে তাদের ধর্মীয়-উপাসনায় বাধার সৃষ্টি হয়, তাহলে মুসলমানরাও সেখানে যুদ্ধ করতে পারবে না;

সপ্তমত: শত্রু যদি নিজেরাই ধর্মীয় উপাসনাগুলিকে যুদ্ধের জন্য ব্যবহার করে, তাহলে বাধ্য হয়ে তোমরাও তদ্রূপ করতে পারবে, অন্যথায় পারবে না। এই আয়াতে এই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, উপাসনার স্থানসমূহের আশে-পাশেও যুদ্ধ করা চলবে না। ধর্মীয়-স্থানে আক্রমণ করা, সেগুলোকে ধ্বংস করা বা সেগুলোর কোন ক্ষতিসাধন করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। শত্রু যদি ধর্মীয়-স্থানকে যুদ্ধের জন্য ব্যবহার করে, তবে তার অর্থ হবে সেগুলোর ওপরে প্রতি-আক্রমণের সুযোগ করে দেওয়া। সেক্ষেত্রে ধর্মীয়-স্থানের অনুরূপ কোন ক্ষয়ক্ষতির দায়-দায়িত্ব বর্তাবে শত্রুর ওপরেই, মুসলমানদের ওপরে নয়।

অষ্টমত: শত্রু যদি ধর্মীয়-স্থান বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু করার পরে তার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারে, এবং ঐসব ধর্মীয়-স্থান বা প্রতিষ্ঠান থেকে সরে গিয়ে অন্যত্র যুদ্ধ ক্ষেত্র তৈরী করে, তখন মুসলমানরা তাদের ঐ সকল ধর্মীয়-স্থানে বা প্রতিষ্ঠানের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। এমনকি 'শত্রু সেখান থেকেই আগে যুদ্ধ শুরু করেছে'- এই অজুহাত দেখিয়েও না। বরং তৎক্ষণাৎ তাদেরকেও ঐ সকল স্থানের মর্যাদার খাতিরে- যুদ্ধের স্থল পরিবর্তন করতে হবে।

নবমত: যুদ্ধ ততক্ষণ পর্যন্ত অব্যাহত রাখতে হবে, যতক্ষণ না ধর্মীয়-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা বন্ধ হয়, এবং ধর্মীয় বিষয়াদিকে শুধু হৃদয়ের বিষয়রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এবং সেই সঙ্গে রাজনৈতিক বিষয়াদির ন্যায় ধর্মের ব্যাপারে নাক গলানো বন্ধ করা হয়। শত্রু যদি এ সব বিষয়ের পক্ষে ঘোষণা দেয়, তাহলে সে প্রথমে যুদ্ধ শুরু করলেও, তখন তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে।

(৩) আল্লাহ্ তাআলা সূরা আনফালের ৩৯-৪১ নং আয়াতে বলেছেন: হে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সা.)! শত্রু যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে। এবং তোমাকে আল্লাহ্ তাআলার আদেশ অনুযায়ী ওদের মোকাবেলা করতে হবে। কিন্তু তুমি ঘোষণা করে দাও যে, যদি তারা এখনও যুদ্ধ থেকে বিরত হয়, তাহলে যা কিছু তারা ইতোমধ্যে করেছে তজ্জন্য তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। কিন্তু তারা যদি তা থেকে বিরত না হয়, এবং বার বার হামলা চালায়, তাহলে পূর্ববর্তী নবীদের শত্রুদের পরিণতি তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। পরিণতি তাদের তদ্রূপই হবে। এবং হে মুসলমানগণ! তোমরা ঐ সময় পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাও, যে পর্যন্ত না ধর্মের জন্য কষ্ট দেওয়া বন্ধ হয় এবং ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে খোদা তাআলার ওপর সোপর্দ করা হয় এবং লোকেরা ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা ছেড়ে দেয়। যদি ঐ সব লোক এই সকল বিষয়ে বিরত হয়ে যায়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে শুধু এই কারণে যুদ্ধ করা যাবে না যে, তারা একটা ভ্রান্ত-ধর্মের অনুসারী। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা তো জানেন তাদের আমল (ধর্মীয় কাজকর্ম) কি। তিনি যেভাবে চাইবেন সেইভাবে তাদের সঙ্গে ব্যবহার করবেন। তাদের ভ্রান্ত-ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার তোমাদের দেওয়া হয়নি। যদি তোমাদের এইরূপ শান্তি ঘোষণার পরেও কেউ যুদ্ধ থেকে বিরত না হয়, এবং যুদ্ধ অব্যাহত রাখে, তাহলে সত্যি সত্যিই জেনে রাখ যে, তোমাদের শক্তি কম হওয়া সত্ত্বেও, তোমরাই জয়ী হবে।

কেননা, আল্লাহ্ তখন তোমাদের সঙ্গী হবেন। এবং আল্লাহ্‌র চাইতে উত্তম সঙ্গী ও সাহায্যকারী আর কে হতে পারে? এই আয়াত কুরআন করীমে বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে উল্লেখিত হয়েছে যে, যুদ্ধ ছিল আরবের কাফেরদের এবং মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম নিয়মিত যুদ্ধ। আরবের কাফেররা বিনা কারণে, মুসলমানদের ওপরে আক্রমণ করা সত্ত্বেও, মদীনার আশেপাশে ফাসাদ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করা

সত্ত্বেও, এবং মুসলমানরা জয়লাভ করা সত্ত্বেও, এবং কাফেরদের বড় বড় নেতারা নিহত হওয়া সত্ত্বেও, কুরআন করীম মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমে এই ঘোষণা দিয়েছে যে, এখনও তোমরা যদি ক্ষান্ত হও, তাহলে আমরা যুদ্ধ বন্ধ করে দেব। আমরা তো শুধু এতটুকুই চাচ্ছিলাম যে, জোর করে ধর্মান্তরিত করা যাবে না এবং ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

(৪) আল্লাহ্ তাআলা সূরা আনফালের ৬২ ও ৬৩ নং আয়াতে বলেন: কখনও যদি কাফেররা সন্ধির দিকে ঝুঁকে, তাহলে তৎক্ষণাৎ তাদের কথা মেনে নিও এবং সন্ধি স্থাপন করিও। এবং এই ধারণা করিও না যে, ওরা ধোঁকাও তো দিতে পারে। বরং আল্লাহ্‌র ওপরে নির্ভর কর। আল্লাহ্ প্রার্থনা শ্রবণকারী এবং তিনি সর্বজ্ঞ। যদি, তোমাদের এই ধারণা ঠিকও হয় যে, ওরা ধোঁকা দিতে চাচ্ছে, এবং ধোঁকা দেওয়াই যদি তাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহলেও মনে রেখো যে, তাদের ধোঁকাতে তোমাদের কিছু আসে যায় না। তোমরা তো সাফল্য লাভ করেছো কেবল খোদা তাআলার সাহায্যের কারণেই। তাঁর সাহায্যই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। অতীতেও তিনি সরাসরি সাহায্য করেছেন এবং মু'মিনদের মাধ্যমেও তোমাকে সঙ্গ-সহায়তা দিয়ে এসেছেন।

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, দুশমন যখন সন্ধি করতে আগ্রহী হয়, তখন মুসলমানদের উচিত, তাদের সঙ্গে সন্ধি করে ফেলা। যদি তারা সন্ধির শর্তাবলী প্রকাশ্যে পালন করতে রাজি হয়, তাহলে শুধু এই অজুহাতে সন্ধির প্রস্তাব নস্যাৎ করা যাবে না যে, শত্রুর উদ্দেশ্য হয়ত ভাল নয়, এবং তারা সম্ভবত: পুনরায় আক্রমণ করার জন্য পাঁয়তারা করছে।

এই আয়াতগুলিতে প্রকৃত প্রস্তাবে, হুদায়বিয়ার সন্ধির ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এমন এক সময় আসবে, যখন দুশমন সন্ধি করতে চাইবে। সে সময়ে তোমরা শত্রু বাড়াবাড়ি করতে পারে বা পরে তারা এই চুক্তি ভঙ্গ করতে পারে এই অজুহাতে সন্ধি করতে অস্বীকার করো না। কেননা, এটাই পুণ্যকাজের দাবী, এবং এর মধ্যেই নিহিত তোমাদের মঙ্গল। কাজেই, সন্ধির প্রস্তাব এলে তোমরা তা গ্রহণ করবে।

আল্লাহ তাআলা সূরা নিসার ৯৫ নং আয়াতে বলেছেন: হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন খোদা তাআলার খাতিরে যুদ্ধের জন্য বের হও, তখন একটা ব্যাপারে তোমাদেরকে নিশ্চিত হতে হবে যে, যুদ্ধ না করার পক্ষে সকল যৌক্তিকতা তোমরা তোমাদের শত্রুর নিকটে সম্পূর্ণরূপে পেশ করেছ, তথাপি তারা যুদ্ধ করতে চাচ্ছে। কিন্তু, যদি কোন ব্যক্তি বা দল কখনও বলে, 'আমি বা আমরা সন্ধি করতে চাই', তখন তাদেরকে বলবে না, 'তোমরা তো ধোঁকা দিতে চাচ্ছ। আমরা এটা আশা করতে পারি না যে, তোমাদের থেকে আমরা কোন নিরাপত্তা পাব।' তোমরা যদি এইরূপ কথা বল, তাহলে বুঝতে হবে যে, তোমরা খোদার রাস্তায় যুদ্ধ করার লোক নও, বরং তোমরা দুনিয়ার প্রত্যাশী। কাজেই, এরূপ করবে না। কেননা, যেভাবে খোদা তাআলার কাছে দ্বীন (ধর্ম) আছে, তেমনিভাবে তাঁর কাছে দুনিয়ারও সব মাল-সামান আছে। তোমাদের মনে রাখা উচিত যে, কোন লোককে হত্যা করাটা আসল উদ্দেশ্য নয়। তুমি এটা জান যে, সে হয়তো আগামীকালই হেদায়াত পেয়ে যাবে। তুমিও তো নিজে এর আগে ইসলামের বাইরে ছিলে, পরে আল্লাহ্ তাআলা কৃপা করে তোমাকে এই ধর্ম গ্রহণের তৌফিক দিয়েছেন। কাজেই, হত্যা করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবে না। বরং প্রকৃত অবস্থা জানবার চেষ্টা করবে। মনে রাখবে যে, তুমি যা করছো তা আল্লাহ্ ভালোভাবেই জানেন।

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে, তখন এ বিষয়ে ভালভাবে জানার চেষ্টা করবে যে, শত্রু আসলে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করছে কি-না। কেননা, এমনও হতে পারে যে, শত্রু আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করতে চাইছে না। বরং সে কোন কারণে ভয় পেয়ে গেছে বলেই সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। কাজেই প্রথমে নিশ্চিত রূপে জেনে নিতে হবে যে, শত্রু আসলেই আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করতে চাচ্ছে কি-না। যদি তাই হয়, তাহলে তুমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারবে। আর যদি সে বলে, 'যুদ্ধ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমরা শুধু ভয় পেয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম।' তাহলে তোমরা একথা বলতে পারবে না, 'না, তোমাদের প্রস্তুতিই বলে দিচ্ছে যে, তোমরা আমাদের ওপর আক্রমণ করতে চাচ্ছ। আমরা কি করে বুঝবো যে, আমরা তোমাদের কাছ থেকে নিরাপদে থাকবো, রক্ষা পাবো? বরং তোমরা তাদের কথা বিশ্বাস করো এবং মনে কর যে, প্রথমে তাদের আক্রমণের ইচ্ছা থাকলেও এখন সে ইচ্ছার পরিবর্তন ঘটে গেছে। কেননা, তোমরা নিজেরাই সাক্ষী যে হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটে থাকে। তোমরা অনেকেই আগে ইসলামের দুশমন ছিলে, কিন্তু তোমরা এখন ইসলামের সৈনিক।

(৬) কুরআন করীমের সূরা তওবার ৪নং আয়াতে দুশমনের সঙ্গে অঙ্গীকার সম্পর্কে বলা হয়েছে :

'মুশরেকদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের সঙ্গে কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছিল, এবং তারা সেই অঙ্গীকার ভঙ্গও করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের শত্রুকে সাহায্যও করেনি। তাহলে অঙ্গীকারের মেয়াদকাল পর্যন্ত তোমরাও তা পালন করো, এবং অঙ্গীকারের যুক্তিকে কায়েম রাখো। এটাই হচ্ছে তাক্ওয়ার (খোদা-ভীরুতার) লক্ষণ; আল্লাহ্ তাআলা মুত্তাকীগণকে (খোদা-ভীরুগণকে) ভালবাসেন'।

(৭) সেই শ্রেণীর শত্রুরা, যারা যুদ্ধরত আছে তাদের মধ্যে কেউ যদি ইসলামের সত্যতা জানতে চায় তার সম্পর্কে সূরা তওবার ৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে: যদি যুদ্ধরত মুশরেকদের মধ্য থেকে কেউ এই উদ্দেশ্যে আশ্রয় প্রার্থনা করে যে, সে তোমাদের কাছে এসে ইসলামের সত্যতা জানতে চায়, যাচাই করতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই আশ্রয় দিতে হবে ততদিন পর্যন্ত, যতদিন না সে ভালভাবে ইসলামের সত্যতা যাচাই করে দেখতে পারে এবং কুরআন করীমের বাণী ও বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত হতে পারে। পরে তাকে নিজ দায়িত্বে সেই স্থান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতে হবে, যে স্থানে সে যেতে চায় এবং যেখানে সে নিজকে নিরাপদ মনে করে।

(৮) যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে কুরআন মজীদের সূরা আনফালের ৬৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

কোন নবীর মর্যাদার পক্ষে এটা যথাযোগ্য নয় যে, সে তার শত্রুকে যুদ্ধ বন্দী করে রাখে, একমাত্র তাকে ছাড়া যে নিয়মিত যুদ্ধে যোগ দিয়ে বন্দী হয়েছে। অর্থাৎ, ঐ যুগে এ প্রথা প্রচলিত ছিল এবং তার পরেও কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রচলিত

ছিল যে, শত্রুপক্ষের লোককে যুদ্ধ ছাড়াও গ্রেফতার করে বন্দী করা বৈধ। কিন্তু ইসলাম তা পছন্দ করে না। সেই সকল লোককেই কেবল যুদ্ধবন্দী বলা যাবে, যারা নিয়মিত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল এবং যুদ্ধের সময়েই বন্দী হয়েছিল।

(৯) আবার ঐ সকল বন্দী সম্পর্কে সূরা মোহাম্মদ -এর ৫নং আয়াতে বলা হয়েছে: যুদ্ধবন্দীদেরকে যখন গ্রেফতার করা হবে, তখন হয় তাদেরকে দয়া করে ছেড়ে দাও, নয়তো মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করে দাও।

(১০) যদি কোন যুদ্ধ বন্দী এমন থাকে যে, তার পক্ষে মুক্তিপণ দেওয়ার মত কেউ নেই, কিংবা তার আত্মীয়স্বজনরা তার মাল-সম্পত্তি আত্মসাৎ করার মানসে এটাই চায় যে, সে বন্দী অবস্থাতেই থাকুক, তাহলে তার সম্পর্কে সূরা নূরের ৩৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে: তোমাদের যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা দয়া প্রদর্শন করে ছাড়তে পার না, এবং যাদের পক্ষে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করে নেওয়ার মত কেউ নেই, তারা যদি তোমাদের কাছে এই দাবী করে যে, তাকে ছেড়ে দিলে সে তার পেশায় নিয়োজিত হয়ে টাকা-পয়সা উপার্জন করে তার মুক্তিপণের টাকা পরিশোধ করে দিবে, এবং সে যদি কামাই রোজগারের যোগ্যতা রাখে, তাহলে তাকে অবশ্যই মুক্ত করে দিতে হবে। বরং নিজেও তাকে তার কাজে সহায়তা করবে। এবং খোদা তোমাকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তা থেকে তাকে কিছু অংশ দিয়ে দিতে হবে, কিংবা যুদ্ধের খরচা বাবদ তার কাছে যে প্রাপ্য ধার্য করা হয়েছে, তা থেকে তার মালিক তাকে কিছু মাফ করে দিবে অথবা অন্যান্য মুসলমানদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে হলেও তাকে সাহায্য করবে। এবং পরিশেষে তাকে মুক্তি দিয়ে দিবে।

এসব হচ্ছে সেই সকল অবস্থা, যে যে অবস্থায় ইসলাম যুদ্ধের অনুমতি দান করে। এবং এই হচ্ছে সেই নীতি-মালা যার আওতায় ইসলাম যুদ্ধের অনুমতি দান করে। সুতরাং কুরআন করীমের এই সকল আয়াতের আলোকে রসূল করীম (সা.) যে সব অবশ্য পালনীয় শিক্ষা মুসলমানদের দান করে গেছেন তা হচ্ছে:

(১) মুসলমানরা কোন অবস্থাতেই মৃতদেহ বিকৃত করতে পারবে না, অর্থাৎ যুদ্ধে মুসলমানদের দ্বারা নিহত ব্যক্তির লাশ লাঞ্ছিত করতে পারবে না। লাশের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাটতে পারবে না, (মুসলিম)।

(২) মুসলমানরা যুদ্ধে ধোঁকাবাজির আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে না।

(৩) শিশু ও নারী হত্যা করতে পারবে না (মুসলিম) ।

(৪) পাদ্রী, পুরোহিত, প্রভৃতি ধর্মের সেবায় নিয়োজিত কোন ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারবে না (তাহাবী)।

(৫) বৃদ্ধ ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারবে না, নারী হত্যা করতে পারবে না এবং সব সময় শান্তি প্রতিষ্ঠা ও দয়া প্রদর্শনের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে, (আবুদাউদ)।

(৬) মুসলমানরা যখন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে শত্রুর দেশে প্রবেশ করবে, তখন ভীতি ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি করতে পারবে না। সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার করতে পারবে না (মুসলিম)।

(৭) যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে এমন স্থানে শিবির স্থাপন করতে পারবে না, যেখানে লোকজনের অসুবিধা হবে। এবং এমনভাবে কুচকাওয়াজ বা মার্চ করে অগ্রসর হতে পারবে না, যাতে সাধারণ মানুষের চলাচলের অসুবিধা হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বিষয়টা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন যে, যে ব্যক্তি এই সব হুকুম অমান্য করবে, তার যুদ্ধ হবে তার নিজের প্রবৃত্তি বা নফ্‌সের জন্য, খোদার জন্য নয়। (আবুদাউদ)

(৮) যুদ্ধের সময় শত্রুর মুখমন্ডলে আঘাত করতে পারবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

(৯) যুদ্ধের সময় চেষ্টা করতে হবে যাতে শত্রুর যথাসম্ভব কম ক্ষতি হয়। (আবুদাউদ)

(১০) যারা গ্রেফতার হবে অর্থাৎ যুদ্ধ-বন্দী হবে, তাদের মধ্যে নিকট আত্মীয় থাকলে তাদেরকে অন্যদের থেকে পৃথক করা যাবে না। (আবুদাউদ)

(১১) যুদ্ধবন্দীদের আরামের প্রতি নিজেদের আরামের চাইতে বেশি খেয়াল রাখতে হবে। (তিরমীযি)

(১২) ভিনদেশী দূত ও প্রতিনিধিদের প্রতি সম্মান ও শিষ্টাচার বজায় রাখতে হবে; তারা ভুল ও শিষ্টাচার বিরোধী আচরণ করলেও তা উপেক্ষা করতে হবে। (আবুদাউদ, কিতাবুল জিহাদ)।

(১৩) যদি কেউ যুদ্ধ-বন্দীর প্রতি অত্যাচার করে, তাহলে সেই যুদ্ধ-বন্দীকে বিনা মুক্তিপণে মুক্ত করে দিতে হবে।

(১৪) যে ব্যক্তির কাছে কোন যুদ্ধ-বন্দীকে রাখা হবে, তাকে সে তা-ই খেতে দিবে যা সে নিজে খায়; তাকে সেই কাপড় পড়তে দিবে, যা সে নিজে পড়ে (বুখারী)। হযরত আবু বকর (রা.) এই আদেশাবলীর আলোকে এই সম্পূরক আদেশটিও দিয়ে গেছেন যে, দালান কোঠা ভাঙ্গতে পারবে না, ফলবান বৃক্ষ কাটতে পারবে না। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক মুজাতাবাঈ, কিতাবুল জিহাদ, পুষ্ঠা: ৩৬৭)।

(১৫) এই সকল আদেশ নিষেধ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ইসলাম যুদ্ধ রহিত করার জন্য কত উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং রসূল করীম (সা.) কত প্রকৃষ্টরূপে এই সকল শিক্ষা অনুসরণ করার জন্য নির্দেশ ও তাকিদ দিয়ে গেছেন। প্রত্যেকেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, এই যুগে না মূসার (আ.) শিক্ষাকে সুবিচারের শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করা যাবে, না এই যুগে মসীহ্ (আ.)-এর শিক্ষাকে অনুসরণ করা যাবে, না কখনও তা অনুসরণ করেছে খৃষ্টান জগৎ। একমাত্র ইসলামের শিক্ষাই অনুসরণযোগ্য, যা পালন করে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

...আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যা লক্ষ্য করা গেছে এবং মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনায় যা যথার্থ বলে প্রতিভাত হয়েছে, তাতে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম প্রদত্ত শিক্ষা এবং প্রদর্শিত পদ্ধতি ও পন্থাই সঠিক ও সর্বোত্তম।

*"আল্লাহুম্মা সাল্লে 'আলা মুহাম্মাদেঁও ওয়া আলা আলে মুহাম্মদ ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ"*

[হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) রচিত 'নবীনেতা' হযরত মুহাম্মদ (সা.) পুস্তক থেকে]। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মহানবী (সা.) এমন কোন প্রদক্ষেপ বাদ রাখেননি, সব ধরণের চেষ্টা-প্রচেষ্টা করেছেন আর এতে তিনি (সা.) শতভাগ সফলও হয়েছেন। অথচ আজ সেই মহানবী (সা.)-এর উম্মত দাবীদার এক শ্রেণীর উগ্র-ধর্মান্ধরা ইসলামের নামে দেশ ব্যাপী যে অরাজকতা সৃষ্টি করছে তা কোনভাবেই ইসলাম ও মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা হতে পারে না।

(চলবে)

masumon83@yahoo.com

# ধর্ম কর্মে সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত মানুষের কথা

*ডা: শেখ হেলালউদ্দীন আহমদ*

দুনিয়াতে মানুষ আছে অনেক এবং আছে অনেক ধর্ম। তবে ধর্ম কর্মে সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত মানুষের কথা ভাবে না মানুষ। বর্তমান বিশ্বে ধর্ম কর্মে সুযোগ-সুবিধা থাকলে একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামা'তেই আছে। যেহেতু এই জামা'ত সম্পূর্ণ একটি অরাজনৈতিক সংগঠন বা জামা'ত। এই জামা'তে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণাও নেই। কারণ এটি একটি আধ্যাত্মিক জামা'ত। এই জামা'তের ইমাম বা নেতা এক, যেমন আল্লাহ্ এক। বিশ্ব স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ তা'লার মনোনীত মানুষ ছাড়া ধর্মের নেতা হওয়া যায় না।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যেমন একমাত্র নেতা, যিনি সারা জগতের মানুষকে ধর্ম-কর্মের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে দুনিয়াতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর অবর্তমানে পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআনের আয়াতে ইস্তেখলাফের নির্দেশানুসারে ইসলামে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ইতিহাস সকলেরই জানা। অত:পর হযরত নবী করীম (সা.) এমন ভবিষ্যদ্বাণীও করে গেছেন যে, এই খেলাফত ততদিন প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতদিন আল্লাহ্ চাইবেন। তারপর 'খেলাফত আলা মিনহাযিন নবুওয়ত' অনুসারে পুণরায় খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। যাহোক আল্লাহ্‌র ওয়াদানুযায়ী আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে সেই খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

ওয়াদা তো মানুষও করে, দুনিয়ার রাজা বাদশাহ্ করে আর অনেক রাষ্ট্র প্রধানগণও করে। কিন্তু সেই ওয়াদা অনেকেই রক্ষা করতে সক্ষম হয় না। তবে মহান আল্লাহ্ তা'লার বেলায় কোন পরিবর্তন, কোন পরিবর্ধন হয় না এবং হবেও না। মনে রাখতে হবে যে, খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে, দুনিয়ার সকল ধর্মের মানুষকে, খেলাফত হারা মুসলমানদেরকে একত্রিত করা এবং ধর্ম কর্মে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তা কিরূপ? প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, ইসলাম ধর্ম ছাড়াও অপরাপর ধর্মের ধর্ম যাজকগণ এবং মুসলমানদের ধর্ম-ব্যবসায়ীরা যেমন পীরের নিজ নিজ স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে অতি কৌশলে অর্থ উপার্জন করে থাকে। মাজার পূজারী বা মাজার ভক্তরা মাজারের ব্যবসা করে অর্থ উপার্জন করে থাকে।

কোন কোন পীরের মুরীদান সংখ্যায় আবার লাখ লাখ। এই মুরীদানরা যদি পীরের হাতে কম করে হলেও পাঁচ, দশ টাকা করেও নজরানা দেয় তাহলেও তো কোটি টাকা এসে যায় এতে কোন সন্দেহ নেই।

যাহোক তবে এখানে আরো একটি প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, ধর্ম-কর্মে সুযোগ-সুবিধা হবে কিরূপে?

এই প্রশ্নের উত্তর খুবই সহজ। যেহেত পবিত্র গ্রন্থ আল কুরআন এর মীমাংসা করেই রেখেছে যে, যারা গায়েবের-অদৃশ্যের ওপর ঈমান আনে এবং নামায কায়েম করে। আর আমরা তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। (সূরা বাকারা : ৪) সুতরাং পৃথিবীতে বর্তমানে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তেই সেই ব্যবস্থা রয়েছে যা পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে। অতএব অন্যান্য ধর্মের অনুসারী এবং মুসলিমদের সকল ফিরকার মানুষই এইরূপ সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত যা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা বন্দোবস্ত করে রেখেছেন। মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্‌র ব্যবস্থা আর মানুষের তৈরীকৃত ব্যবস্থা এক নয়।

পৃথিবীতে এমন বিদ'আত মুক্ত ও বাজেটভুক্ত জামা'ত বা সংগঠন থাকলে মাত্র একটিই আছে তা হচ্ছে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত। বাকীরা সবাই বিদআত যুক্ত ও বাজেটমুক্ত।

অত:পর খাস দিলে এই জামা'তে যারাই প্রবেশ করেন তারা পরিষ্কার বুঝতে পারেন যে, ইসলামে নাশকতা, সহিংসতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করা গুরুতর অপরাধ।

বর্তমানে বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশেই হত্যা, ছিনতাই ও ধ্বংসাত্মক কাজের প্রতিযোগিতা চলছে। অথচ পবিত্র কুরআন বলছে, তোমরা পরস্পর নেক (পুণ্য) কাজে প্রতিযোগিতা কর। কিন্তু এর পরিবর্তে চলছে মন্দ কাজের প্রতিযোগিতা। সাম্প্রতিক কালে ধর্মের নামে এ দেশেই ঘটে গেল অনেক দুর্ঘটনা, যা খুবই দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক।

অতএব আমরা যারা ধর্ম-কর্মে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছি, আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে মহানবী ও বিশ্বনবী (সা.)-এর আদর্শ ও তাঁর পবিত্র শিক্ষাকে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাক্ওয়ার ভিত্তিতে জনগণের নিকট সঠিকভাবে তুলে ধরা আর এজন্যই এই রূহানী জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পরিশেষে আমাদের দোয়া ও কামনা রইলো এহেন পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে আল্লাহ্ আমাদের সকলের প্রতি সহায় হোন, আমীন।


## প্রকাশিত হয়েছে

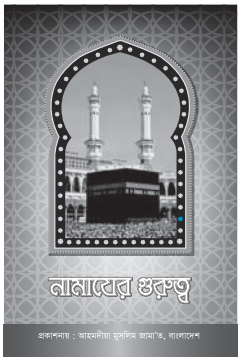


পাঠকের ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে **হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)** প্রদত্ত নামায সংক্রান্ত পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ খুতবা সম্বলিত আকর্ষণীয় বই-

**'নামাযের গুরুত্ব'** দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

**বইটির মূল্য ৩০/- (ত্রিশ) টাকা মাত্র।**

বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

**আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন এবং এর থেকে উপকৃত হোন।**

নবীনদের পাতা-

# রোযা মুত্তাকী হওয়ার ব্যবস্থাপত্র

*নাবিদ আহমদ লিমন*
শিক্ষার্থী, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

ইসলামী ইবাদতের দ্বিতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ রোকন বা স্তম্ভ হল রোযা। চন্দ্র বছরের নবম মাসের নাম 'রমযান'। রমযান শব্দটি 'রময' মূল ধাতু হতে এসেছে। এর অর্থ পিপাসায় উত্তপ্ত হওয়া। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ সম্পর্কে বলেছেন, 'আরবী ভাষায় সূর্যের তাপকে রময বলা হয়। যেহেতু রমযান মাসে রোযাদার পানাহার ও যাবতীয় দৈহিক ভোগ বিলাস হতে বিরত থাকে এবং আল্লাহ্‌র আদেশ সমূহ পালন করার উদ্দেশ্যে নিজের প্রাণের ব্যগ্রতার তাপ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে সেজন্য এ আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক উভয় প্রকার তাপের সংমিশ্রণে রমযান হয়েছে। (আল হাকাম, ২ শে জুলাই, ১৯০১)

পবিত্র কুরআন করীম রোযাকে মুত্তাকী বানানোর ব্যবস্থাপত্র হিসেবে অভিহিত করেছেন। যেমন আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরবান করীমের সূরা বাকারার ১৮৪নং আয়াতে বলেন– "ইয়া আইয়্যুহাল্লাযিনা আমানু কুতিবা আলাইকুমুস সিয়ামু কামা কুতিবা আলাল্লাযিনা মিন কাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকুন।" যারা এই ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী আমল করে তারা মুত্তাকী হতে পারবে।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের দ্বিতীয় বছর মুসলমানদের ওপর রোযা ফরয করা হয়। রোযার প্রকৃত তাৎপর্য, গুরুত্ব ও রোযার নিয়ম কানুন সবই সূরা বাকারায় ২৩তম রুকুতে আল্লাহ্ তা'লা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

রোযার তাৎপর্য সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লিখেছেন, "অল্প আহার এবং ক্ষুধা সহ্য করাও আত্মশুদ্ধির জন্য আবশ্যক। এতে দিব্যদর্শণ শক্তি বৃদ্ধি পায়। মানুষ শুধু খাদ্য গ্রহণ করে বাঁচে না। যে ব্যক্তি অনন্ত জীবনের প্রতি লক্ষ্য করা একেবারেই পরিত্যাগ করে, সে নিজের ওপর "ঐশীকোপ" (কহরে ইলাহী) আনয়ন করে।

রোযাদারকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, রোযার অর্থ শুধু এটা নয় যে, মানুষ অনাহারে থাকবে; বরং খোদার স্মরণে ব্যস্ত থাকা উচিত। মহানবী (সা.) রমযান মাসে অনেক বেশি ইবাদত করতেন। এ দিনগুলোতে পানাহারের চিন্তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি মনোনিবেশ করা উচিত। দুর্ভাগ্য সেই ব্যক্তি, যে দৈহিক প্রয়োজনে খাদ্য গ্রহণ করে কিন্তু আধ্যাত্মিক খাদ্যের পরওয়া করে না। বাহ্যিক খাদ্যে দৈহিক শক্তি লাভ হয় আর আধ্যাত্মিক খাদ্যে আত্মা সতেজ হয়। খোদার নিকট সফলতা চাও। কেননা তিনি সামর্থ্য দিলেই সকল দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায়।"

অল্প আহারে দেহ শক্তিশালী হয়। কেননা খোদার স্মরণই আত্মার খোরাক। জড় খাদ্য ও ভোগ-বিলাসে আত্মা মৃতবৎ হয়ে যায় এবং রোযার মাধ্যমে যিকরে ইলাহীতে আত্মা জাগ্রত, সতেজ ও ঐশী শক্তিতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ঐশী বিধান সম্মত রোযা মানুষকে ঐশী রঙ্গে রঙ্গিন করে।

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'লা বলেন, প্রত্যেক নেকীর জন্য আমি কোন না কোন বস্তুর আকারে পুরস্কার নির্ধারিত করেছি। কিন্তু রোযার পুরস্কার আমি স্বয়ং।" এর অর্থ এই যে, সকল রোযাদারের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় জ্যোতিঃ ও শক্তির বিকাশ করে থাকেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) রোযার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, আমাদের দেহে দৈনিক যে রুহানী বিষ সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা দৈনিক পাঁচবার নামাযের ব্যবস্থা করেছেন। আর সারা বছরে যে বিষ জমা হয় তা দূর করার জন্য রমযানে এক মাস রোযার ব্যবস্থা করেছেন। রোযা না করার ফলে বছরব্যাপী পুঞ্জীভূত বিষ বাড়তেই থাকে এবং এর ফলে সেই ব্যক্তির মাঝে এরূপ কাঠিন্য এবং এরূপ দৃষ্টিহীনতার সৃষ্টি হয় যে, খোদা তা'লা তার সম্মুখে এলেও সে চিনতে পারে না। যেমন কোন ব্যক্তি তার দৃষ্টিশক্তি হারালে তার নিকটাত্মীয় সম্মুখে আসলেও সে তাকে চিনতে পারে না।

অনেকে মনে করে যে, তারা রোযা রেখে খোদার ওপর এহসান করেছে। এরূপ মনে করা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই না। যখন কেউ রমযান মাসে রোযা রাখে, তখন সে খোদা তা'লার ওপর এহসান করে না বরং এটা তার ওপর খোদা তা'লার এহসান যে, তিনি এরূপ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সুতরাং এ মাসের প্রতি সম্মান দেখানো আমাদের বিশেষ কর্তব্য। আমরা এ দিনগুলোকে যত বেশি সদ্ব্যবহার করবো; আমাদের অন্তরের পুঞ্জিভূত বিষ ততই দূর হয়ে যাবে যেগুলো ভিতরে ভিতরে আধ্যাত্মিক জীবনকে নষ্ট করে দিচ্ছিল' (আল ফযল, ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৬৫)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) রমযানের ইবাদত সম্বন্ধে বলেন, "মাহে রমযান পাঁচটি ইবাদতের সমষ্টি। প্রথমটি হলো রোযা রাখা, দ্বিতীয় ফরয নামায ছাড়াও রাত্রি জাগরণ অর্থাৎ রাতে নফল ইবাদত করা এবং বিনয়ের সাথে নিজ প্রভুর নিকট সর্বপ্রকার মঙ্গল কামনা করা। তৃতীয় বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করা। চতুর্থ দান খয়রাত করা এবং পঞ্চম প্রবৃত্তির কু-প্ররোচনা হতে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করা।"

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে পবিত্র এই রমযান মাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করে রমযান মাসে রোযা রাখার তৌফিক দান করুন, আমীন।

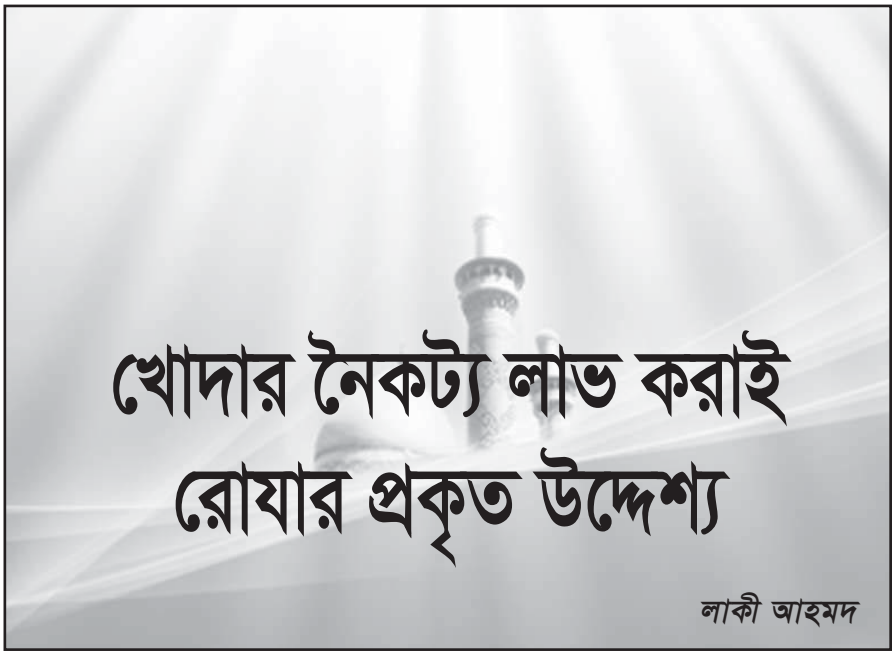

# খোদার নৈকট্য লাভ করাই রোযার প্রকৃত উদ্দেশ্য

*লাকী আহমদ*

প্রতি বছর রোযা আসে আর যায়। এই আসা আর যাওয়ার নামই রোযা নয়। এ পবিত্র মাস থেকে আমরা যে কল্যাণ ও আশীষ লাভ করব সেটাই হবে আমাদের জন্য প্রকৃত রোযা। শুধু উপবাস থাকার নামই রোযা নয় বরং প্রকৃত রোযা হলো আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জন করা। রমযানে রোযার নির্দেশ এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা এরশাদ করেন- 'হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের ওপর রোযা বিধিবদ্ধ করা হল, যেরূপ তোমাদের পূবর্তীগণের ওপর বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল। যেন তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন করতে পার।

(ফরয রোযা) নির্দিষ্ট দিনগুলোতে, কিন্তু তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়ত হয় অথবা সফরে থাকে, তাহলে তাকে অন্য সময়ে এ সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে, এবং যাদের পক্ষে ইহা (রোযা রাখা) ক্ষমতাতীত, তাদের ওপর ফিদিয়া-এক মিসকীনকে আহার্য দান করা, অতএব যে কেউ স্বেচ্ছায় পুণ্য কর্ম করবে, তা অবশ্যই তার জন্য উত্তম হবে। বস্তুত: তোমরা যদি জ্ঞান রাখ তাহলে জানিও যে তোমাদের জন্য রোযা রাখাই কল্যাণকর।"

রমযান সেই মাস যাতে নাযেল করা হয়েছে কুরআন যা মানবজাতির জন্য হেদায়াতস্বরূপ এবং হেদায়াত ও ফুরকান (হক্ ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী) বিষয়ক সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ এই মাসকে পায়, সে যেন এতে রোযা রাখে, কিন্তু যে কেউ রুগ্ন এবং সফরে থাকে তাহলে অন্য দিন গণনা পূর্ণ করতে হবে, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চান এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চান না, এবং যেন তোমরা গণনা পূর্ণ কর এবং আল্লাহ্র মহিমা কীর্তন কর, এই জন্য যে, তিনি আমাদেরকে হেদায়াত দিয়েছেন এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (সূরা বাকারা: ১৮৪-১৮৬) উপরোক্ত আয়াত অনুসারে রমযান মাসে রোযা রাখার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করে আল্লাহ্ তা'লা উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে বলছেন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে উপবাস ব্রত পালন তোমাদের পূর্বের ধর্মগুলোর মধ্যেও প্রচলন ছিল, কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ উম্মতের মাঝে যে রোযার বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, তা কোন সাধারণ বিষয় নয়, কেননা এই উম্মতে শুধু মাত্র উপবাস-ব্রত পালন করাই রোযার উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হল খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জন করা।

মহানবী (সা.) রোযার গুরুত্ব প্রসঙ্গে বলেন: হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) বর্ণনা করেন রসূল করীম (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখে এবং পরবর্তীতে ঈদের দিন বাদ দিয়ে সাওয়াল মাসের ছয়টি রোযা রাখে সে ক্ষেত্রে সে যেন সারা বছরই রোযা রাখলো' (মুসলিম)। হযরত নবী করীম (সা.) এর উপরোক্ত হাদীস থেকেও আমরা বুঝতে পারি, রমযানের রোযা রাখা আমাদের জীবনে কত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রোযা রাখার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করে বলেন, 'রোযা রাখার পুরস্কার অতি মহান তাতে কোন সন্দেহ নাই। রোযা হৃদয়ে উজ্জ্বলতা প্রদান করে ও কাশফের দ্বার উন্মুক্ত করে। সুফিগণ বর্ণনা করেছেন যে, এই মাসে বহুল পরিমাণ কাশ্ফ (আধ্যাত্মিকতা) লাভ হয়ে থাকে। নামায 'তাযকিয়া'-এ নফ্স (আত্মশুদ্ধি) সাধিত করে এবং রোযায় তাজাল্লিয়ে-কলব সাধিত হয়। অর্থাৎ কাশফ বা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞানের দুয়ার উন্মুক্ত হয়ে খোদার দর্শন লাভ করে' (বদও, ১লা ডিসেম্বর, ১৯০২)।

রোযা রাখার মাধ্যমে আমাদের মাঝে আধ্যাত্মিকতা সৃষ্টি হয়। যাতে রোযাদার মুত্তাকী হয় এজন্য রোযা ফরয করা হয়েছে। সে বুঝতে পারে যে, ইচ্ছা করলে এক সময় পর্যন্ত হালাল জিনিষ থেকে বিরত থকার ন্যায় নিষিদ্ধ বিষয়গুলো হতেও ইচ্ছা করলে বিরত থাকতে পারে এবং দরিদ্রদের অবস্থা সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে পারে এছাড়া অপরের কষ্ট অনুভবও করা যায়।

তাছাড়া সম্পূর্ণ একমাস এজন্য রোযা রাখা হয়েছে যাতে 'নফস' দমন হয় আর রূহানীয়তের বিজয় লাভের জন্য বহু সময়ের প্রয়োজন সেজন্য আল্লাহ্ তা'লা একমাস রোযা রাখা মু'মিনের জন্য ফরজ করে দিয়েছেন।

হযরত সাহ্ল ইবনে সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) বলেন : 'জান্নাতের একটি দরজা আছে। তাকে বলা হয় রাইয়ান। কিয়ামতের দিন ঐ দরজা দিয়ে একমাত্র রোযাদাররা প্রবেশ করবে। তারা ছাড়া আর কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। বলা হবে- রোযাদাররা কোথায়? এরপর দরজাটি বন্ধ করে দেয়া হবে এবং তারপর এ দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করবে না' (বুখারী, মুসলিম)। আরেক স্থানে নবী করীম (সা.) বলেছেন : 'যে ব্যক্তি পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে ও সওয়াব লাভের প্রত্যাশায় রমযানের রোযা রাখে তাঁর পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে' (বুখারী ও মুসলিম)। তাই পবিত্র এই রমযান মাসকে আমাদেরকে ইবাদতের রঙ্গে রঙ্গীন করতে হবে। রমযানে তাহাজ্জুদ

নামায যেভাবে নিয়মিত পড়তে হবে তেমনি প্রত্যেহ নিজের পাপসমূহের ক্ষমার জন্য ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাইতে হবে। সেই সাথে এ রমযানে সব আহমদী ভাই বোনদের জন্য দোয়া করতে হবে, বিশেষ করে পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য। এছাড়া আমাদের প্রিয় খলীফার সুস্থ্যতা ও দীর্ঘায়ূর জন্য অনেক বেশি দোয়া করতে হবে।

পবিত্র এ রমযানে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি দান খয়রাত করা উচিত, যাতে আমাদের আশেপাশের গরীব ভাই-বোনেরা কোন কষ্টে না থাকে। আমাদের মধ্যে অনেকেই এমন আছি যারা রমযানের রোযা রাখি, নামায পড়ি, দরস শুনি, কুরআন পড়ি, কিন্তু রমযান শেষ হওয়ার পর এসবের ওপর আর আমল করি না। তাই সকলের কাছে প্রশ্ন এমন করা কি আমাদের জন্য ঠিক হবে? আমরা যদি রমযানের পর পূর্ণ কর্মগুলো বাদ দিয়ে দেই তাহলে খোদার নৈকট্য লাভতো হবেই না বরং খোদা আমাদের থেকে অনেক দূরে চলে যাবেন।

তাই পবিত্র এই রোযার মাসে আল্লাহ্‌কে অনেক বেশি আপন করে নিতে হবে। আর তাঁকে এমন ভাবে ডাকতে হবে যাতে আমরা আল্লাহ্ তা'লার সান্নিধ্য লাভ করতে পারি। এছাড়া রমযান মাসেই পবিত্র কুরআন শরীফ নাযেল হয়েছে। তাই আমাদের বেশি বেশি কুরআন পাঠ করা উচিত এবং এর অর্থ বুঝে পড়তে হবে। তবেই আমরা খোদা তা'লার প্রিয় বান্দা হতে পারবো।

মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এ পবিত্র রমযান মাসে রোযা রাখার তৌফিক দান করুন এবং রমযানের পরেও যেন এর ওপর আমলকারী হই, আমীন।

# নামায এবং দোয়া

নামাযের মাধ্যমে ইসলাম দোয়ার রাস্তা খুলেছে। দোয়া নামাযের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কারণ, দোয়ার মাধ্যমেই দুনিয়ার সমস্ত হিকমত বা প্রজ্ঞা প্রকাশ পায়। প্রত্যেক জ্ঞানের ঘরের চাবি হচ্ছে দোয়া এবং এমন কোন জ্ঞান ও মা'রেফাতের সূক্ষ্মতা নাই, যা দোয়ার প্রকাশ ছাড়া এসেছে। দোয়া কি? যখন আমরা চিন্তা ও মনোযোগের সময় এক গোপন বিষয়ের সন্ধানে অত্যন্ত গভীর নদীতে হাত-পা নাড়াই, তখন আমরা সেই অবস্থায় নিজ ভাষায় সেই উচ্চ-শক্তির কাছে কল্যাণ অন্বেষণ করি, যার কাছে কোন জিনিস লুকায়িত নয়, সেই কল্যাণ অন্বেষণের অপর নাম হচ্ছে দোয়া।

যখন আমাদের আত্মা একটি জিনিসের অন্বেষণে অনেক উৎসাহ আর মর্মপীড়া ও নমনীয়তার সাথে মূল কল্যাণের দিকে হাত বাড়ায় এবং নিজকে অসহায় পেয়ে চিন্তার দ্বারা অন্য কোন জায়গায় আলো অন্বেষণ করে, তখন প্রকৃতপক্ষে সে দোয়ার দ্বারাই কাজ করে থাকে। দোয়া করার মানে কি? এটাই যে, সেই আলেমুল গায়েব, যিনি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম তাদবীর জানেন বা কৌশল জানেন, কোন উত্তম তাদবীর হৃদয়ে রেখে দেন অথবা সৃষ্টির কারণ ও কুদরত নিজের পক্ষ থেকে তৈরী করেন। অতএব প্রমাণিত হয় যে, দোয়া প্রকৃতপক্ষে তাদবীর বা উপায় অন্বেষণের নাম।

দোয়া এবং তাদবীর মানুষের প্রকৃতির দুই স্বভাবজাত চাহিদা, যা আদি থেকেই এবং যখন থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে যা প্রকৃত-ভাইয়ের মত মানুষের স্বভাবের সাহায্যকারী হিসাবে চলে আসছে। মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতি কোন মুসিবতের সময় যেভাবে চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং চিকিৎসার দিকে ব্যস্ত হয়। এমনভাবে স্বভাবজাত জোশ থেকে দোয়া, সদ্‌কাহ এবং খয়রাতের বা দানের দিকেও ঝুকে যায়। যদি দুনিয়ার সমস্ত জাতির ওপর দৃষ্টি দেওয়া হয় তাহলে জানা যায় যে, এখন পর্যন্ত কোন জাতির বিবেক এই বিষয়ে একমত হওয়ার ওপর বিরোধিতা প্রকাশ করে নাই।

অতএব, এটি একটি আধ্যাত্মিক-দলিল, এই বিষয়ের ওপর যে মানুষের অভ্যন্তরীণ শরীয়তে আদি থেকেই সমস্ত জাতিকে এই ফতোয়াই দিয়েছে যে, তারা যেন দোয়াকে উপায়-উপকরণ, তাদবীর বা চেষ্টা-প্রচেষ্টার জন্য গতিস্বরূপ এবং স্পৃহা-প্রদানকারী। আর তাদবীর হচ্ছে দোয়ার এক উপাদান। অতএব দোয়ার প্রকৃত মানে হচ্ছে তাদবীরকে (উপায়) পাওয়া, প্রশান্তি, শান্তনা ও প্রকৃত সুখ অর্জন করা আর যে ব্যক্তি আত্মনিষ্ঠার সাথে দোয়া করে তো এটা অসম্ভব যে প্রকৃতপক্ষে সে বিফল থাকে। অবশ্যই এটা আল্লাহ্ তাআলা জানেন যে, একজন দোয়াকারী-ব্যক্তির প্রকৃত ভাল কোন বিষয়ে আছে। এই জিনিস খোদা তাআলার হাতে, তিনি যেভাবে চান সাহায্য করেন।

যদি আমরা সেই অবুঝ শিশুর মত, যে নিজের মায়ের কাছে সাঁপ অথবা আগুনের টুকরা চায়, সেভাবে নিজের দোয়াতে চাওয়ার মধ্যে ভুলের ওপর থাকি তখন খোদা তাআলা সেই জিনিস, যা আমাদের জন্য ভালো হয়, তা দান করেন। আর যদি আমরা নিজেদের উদ্দেশ্য অন্বেষণে ভুলের ওপর না থাকি, তাহলে সেই উদ্দেশ্যই কল্যাণ নিয়ে আসে। আর এই সব বিষয় সত্ত্বেও উভয় দিক থেকে আমাদের ঈমানকেও তিনি উন্নতি দান করেন।

কারণ, দোয়া এবং সাড়া দেওয়া বা উত্তর দেওয়ার মধ্যে একটি সম্পর্ক আছে, যা প্রথম থেকেই এবং যখন থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে, সমানভাবে চলে আসছে। যখন খোদা তা'লার ইচ্ছা কোন বিষয় করার প্রতি হয়, তো আল্লাহ্‌র সুন্নত এই যে, তার কোন নিষ্ঠাবান বান্দার অস্থিরতা আর ব্যকুলতা আর ছটফটানির সাথে দোয়াতে ব্যস্ত হয়ে যায়, আর নিজের সমস্ত মনযোগ সেই বিষয় সম্পন্ন হওয়ার জন্য নিবদ্ধ করে। তখনই সেই নশ্বর-ব্যক্তির দোয়াসমূহ ফয়েজে ইলাহীকে আসমান থেকে আকর্ষণ করে, আর খোদা তাআলা এমন নতুন উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করে দেন, যার দ্বারা কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। আর দোয়া কবুল হলে সমস্যা নিবারনের জন্য নতুন উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করা হয়, আর তার জ্ঞান পূর্বেই দেওয়া হয়। আর অন্তত লোহার পেরেকের মত দোয়া কুবলিয়্যতের বিশ্বাস অদৃশ্য থেকে হৃদয়ে বসে যায়। সত্য এটাই যে, যদি দোয়া না হত, তাহলে কোন মানুষ খোদার পরিচয় বা খোদাকে চেনার ক্ষেত্রে হাক্কুল ইয়াকিন পর্যন্ত পৌঁছাতে পারত না।

বাস্তবতা এটাই যে, কোন মানুষ এই কুদরতি নিশানের প্রকাশ পাওয়া ব্যতীত, যা দোয়ার পর প্রকাশ পায়, সেই সত্য যুলজালাল খোদাকে পেতেই পারে না। প্রত্যেক ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি স্মরণ রাখুক যে, এই জীবনে আধ্যাত্মিক-আলোর অন্বেষনের জন্য শুধু

দোয়াই একমাত্র মাধ্যম, যা খোদা তাআলার সত্তার ওপর বিশ্বাস প্রদান করে আর সমস্ত সন্দেহ ও সংশয় দূর করে দেয়। প্রত্যেক দোয়া যদিও সেটা আমাদেরকে দুনিয়াবী-সমস্যা নিবারণের জন্য হয়, কিন্তু সেটা আমাদের ঈমানী অবস্থা এবং উঁচু তরবীয়্যতের মধ্য দিয়েই। অর্থাৎ প্রথমে আমাদেরকে ঈমান ও তত্ত্ব-জ্ঞানে উন্নতি প্রদান করে এবং এক পবিত্র শান্তি আর হৃদয়ের আনন্দ ও প্রশান্তি প্রদান করে। অত:পর আমাদের দুনিয়াবী-বিষয়ের ওপর নিজের প্রভাব বিস্তার করে এবং যেদিক থেকে সম্ভব, সেদিক থেকে আমাদের দুঃখকে দূর করে দেয়।

অতএব দোয়াকে ঐ অবস্থায় দোয়া বলা যায়, যখন প্রকৃপক্ষে তার মধ্যে এক আকর্ষণ শক্তি থাকে আর প্রকৃতই দোয়া করার পর আসমান থেকে এক নূর নেমে, আসে যা আমাদের সংশয় বা উদ্বেগকে দূর করে আর আমাদেরকে আনন্দ প্রদান করে আর সুখ ও শান্তি প্রদান কের। সত্য দোয়ার পর খোদায়ে হাকীম দুইভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা নাযেল করেন। একটি এই যে, সেই বিপদকে দুর করে দেন যার নীচে চাপা পরে আমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। দ্বিতীয় এটি যে, বিপদকে সহ্য করার জন্য আমাদেকে না শুধু অধিক অভ্যাস ও সাহায্য শক্তি দান করেন, বরং এতে সফলতা ও আনন্দ প্রদান করেন। (বারাকাতুদ্দোয়া)।

নামাযে স্বাদহীনতার চিকিৎসা হচ্ছে দোয়া, এর থেকে অবশেষে স্বাদ সৃষ্টি হবে। দোয়া দুই ধরনের হয়ে থাকে, নির্ধারিত এবং অনুমোদিত। নির্ধরিত দোয়ার অর্থ হচ্ছে, উচ্চ পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ দোয়া, যেগুলো সম্ভবপর ছিল তা আমরা দোয়া করার সময় ছেড়ে দেই অথবা তা আমাদের ব্রেইনে বা মাথায় আসতো না। তাই সেগুলো আল্লাহ্ তাআলা এবং তাঁর রসূল (সা.) কুরআন ও হাদীসের মধ্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। যেমন- : আলহামদুলিল্লাহ্ থেকে দোয়াল্লিন পর্যন্ত যে দোয়া আছে সেটা আমাদের ব্রেইনে আসতে পারত না অথবা সামিআল্লাহু লেমানহামিদাহ, রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্‌দ, প্রভৃতি বাক্য। এসব আমাদের চিন্তা ও ধারনায়ও আসতে পারতো না। তাই এগুলোকে খোদা ও তার রসূল (সা.) নিজে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। মারকাসাহ্ (অনুমোদিত) হচ্ছে সেই দোয়াসমূহ, যেগুলো আমরা নিজেদের প্রয়োজনাদীর জন্য নিজ ভাষায় করতে পারি। যেমন : যদি আমাদের আর্থিক ক্ষতি হয়, চাকুরিতে খারাপ অবস্থা হয়, ব্যবসায় উন্নতি না হয় অথবা অন্য কোন প্রয়োজন এসে উপস্থিত হয়, তখন তার জন্য নিজ ভাষায় এবং নিজের প্রয়োজন মত দোয়া করার অনুমতি আছে।

নামাযে যিকর ও দোয়ার পথ দেখিয়ে আল্লাহ্ তা'লা সিফাতে ইলাহী বা খোদার গুণাবলীর ওপর মনযোগ দেওয়ার রাস্তা খুলে দিয়েছেন। মুসলমান নিজেদের নামাযে প্রতিদিন কুরআন করিম পাঠ করে, দোয়া করে, রুকু ও সিজদায় দোয়া করে, সূরা ফাতিহার পবিত্র ব্যখ্যাসমূহ 'রাব্বুল আলামিন, আর রহমান, আর রাহিম, মালিকি ইয়াওমিদ্দিন, ইয়াকানুবুদু ওয়া ইয়া কানাস্তাইন' তার সামনে আসতে থাকে আর সে ওগুলোর ওপর মনযোগ নিবদ্ধ করে। মোটকথা, ইসলাম প্রত্যেক মুসলমানকে এই হুকুম দিয়েছে যে, সে যেন এই দোয়া নিজে পড়ে এবং চিন্তা ও মনযোগের সাথে যেন পড়ে। সুতরাং এভাবে তিনি প্রত্যেকের জন্য খোদার গুণাবলীর ওপর মনযোগ ও চিন্তা করার পথ খুলে দিয়েছেন।

***দোয়া কবুলিয়্যতের শ্রেষ্ঠত্বের ওপর এক আমলী সাক্ষ্য :***

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,– আরবের সেই মরুভূমির দেশে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যে, লাখো মৃত কিছু দিনেই জীবন্ত হয়ে গেল আর সেকালের উশৃংখলরা ইলাহী রঙ ধারন করে আর অন্ধরা দৃষ্টিমান হয় আর বোবাদের মুখে খোদার তত্ত্ব-জ্ঞান জারি হয় আর দুনিয়াতে এমন বিপ্লব তৈরী হল যে, এর পূর্বে না কোন চোখ তা দেখেছে, আর না কোন কান শুনেছে। কিছু লোক জানেন যে, সেটা কি ছিল অন্ধকার রাতের একজন ফানা ফিল্লাহ্‌র দোয়াই ছিল, যিনি দুনিয়াতে সাড়া জাগিয়ে দিয়েছিলেন আর সেই অলৌকিক বিষয় দেখিয়েছেন, যা সেই নিরক্ষর অসহায়ের দ্বারা অসম্ভব মনে হয়েছিল। আল্লাহ্ তাঁর আত্মাকে আশীর্বাদ করে। তাঁর প্রতি শান্তি বর্ষন কর। তাঁর প্রতি ও তাঁর উম্মতের প্রতি এত বেশী বেশী পরিমাণ আশিস বর্ষণ কর, যত বেশী বেশী পরিমাণ ছিল তাঁর উম্মতের জন্য। তাঁর উদ্বেগ-ভালবাসা ও তাঁর চিন্তা, আর যত বেশী পরিমাণে ছিল উম্মতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর ভয়। হে প্রভু, কেয়ামত পর্যন্ত তাঁর উপর তোমার বরকত ও অনুগ্রহরাজি অবিরাম বর্ষণ করতে থাকো। (বারাকাতুদ্দোয়া পৃ: ১০ ও ১১) (ফিকাহ আহমদীয়া ১ম খন্ড, পৃ: ২৬-২৯)

***অনুবাদ: আসিফ আহমদ***


# প্রকাশিত হয়েছে

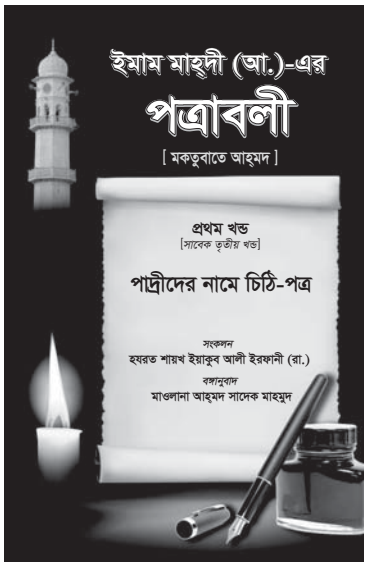


হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বিভিন্ন স্তরের লোকদের কাছে যেসব পত্রাবলী প্রেরণ করেছেন তার প্রথম খন্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় ও দ্বিতীয় খন্ডের প্রথম অধ্যায় বাংলা অনুবাদ **"ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর পত্রাবলী"** নামে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

বঙ্গানুবাদ করেছেন **মাওলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ**।

**বই দু'টির মূল্য যথাক্রমে ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) এবং ৭৫/- (পচাত্তর টাকা)।**

বই দু'টি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

**আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।**

# পবিত্র রমযান মাসের তরবিয়তী কার্যক্রম

আসন্ন পবিত্র রমযান মাস উপলক্ষ্যে সকলকে মোবারকবাদ। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নির্দেশে রমযান মাসে নিম্নোক্ত বিষয় গুলো যথাযথ ভাবে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি-

১। ***রোযা পালন:-*** বিধি মোতাবেক সকলকে রোযা রাখতে উৎসাহিত করুন। বা-জামাত ইফতারীর ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করুন। ইফতারীর পূর্ব মুহুর্তে দোয়া কবুলিয়াতের একটা সময় আসে তার সন্ধানে বন্ধুদেরকে সম্পুর্ন নিরবতা পালন করে আল্লাহ্ তাআলার নিকট বিনয়ের সাথে দোয়ায় রত থাকতে উপদেশ দিন। রমযানের শেষ ১০-দিন মসজিদে ইতিকাফের ব্যবস্থা করুন। এ ছাড়া সমগ্র রমযান মাসব্যাপী বা-জামাত ও ব্যক্তিগত ভাবে বেশী বেশী দোয়া করুন।

২। ***নামায আদায়:-*** কেন্দ্রীয় মসজিদ, হালকা মসজিদ, হালকা নামায সেন্টার বা ব্যক্তিগত বাসায় সকলে একত্রে নিয়মিত বা-জামাত ওয়াক্তিয়া নামায এবং তারাবীহ নামায এর ব্যবস্থা করুন। যেখানে বা-জামাত খতমে তারাবীহ এর ব্যবস্থা করা সম্ভব, সেখানে তার ব্যবস্থা করুন এবং এতে হাজিরা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করুন। সাধ্যনুযায়ী তাহাজ্জোদ নামায বা কমপক্ষে প্রত্যহ সেহেরীর পূর্বে ২-রাকাত নফল নামায আদায়ে বন্ধুদেরকে উৎসাহিত করুন।

৩। ***কুরআন তেলাওয়াত:-*** প্রত্যহ মসজিদ ও নামাজ সেন্টার সমূহে দরসে কুরআন ও ব্যক্তিগত ভাবে বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াতের ব্যবস্থা করুন। যারা কোরান শরীফ পড়তে পারেন তাদেরকে এমাসে কমপক্ষে একবার কুরআন শরীফ (তেলাওয়াত সম্ভব হলে অর্থসহ) খতম করা, যারা ইয়াস্‌সারনাল কোরান পড়ছেন তাদেরকে কুরআন শরীফ পড়ার এবং যারা আরবী জানেন না তাদেরকে ইয়াস্‌সারনাল কুরআন পড়ে শেষ করার লক্ষ্য মাত্রা নিদ্ধারণ করে তা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

৪। ***এমটিএ দেখা:-*** এমটিএতে প্রচারিত হুযূর (আই.)এর প্রদত্ত জুমুআর খুতবা দেখার এবং দরসে কোরান শোনার সেই সাথে বেশী বেশী এমটিএ প্রগ্রাম দেখার অভ্যাস সৃষ্টিতে উৎসাহিত করুন। বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী উদযাপন উপলক্ষে হুযূর (আই.) কর্তৃক তাহরিককৃত বিশেষ দোয়া সমূহ বেশী বেশী পাঠ করা সেই সাথে হুযূর (আই.) এর স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, জামাতে আহমদীয়ার সামগ্রিক উন্নতি এবং নিজ ও পরিবার তথা সকলের মঙ্গল কামনা করে মহান আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া জারী রাখতে বন্ধুদেরকে পরামর্শ দিন।

**এ বছর জামা'ত কর্তৃক ধার্যকৃত মাথাপিছু ফিৎরানার হার ১০০/- (একশত) টাকা, যা নবজাত শিশু থেকে পরিবারের সকলের জন্য প্রদেয়। যারা অস্বচ্ছল তারা অর্ধেক হারে ফিৎরানা দিবেন। যারা রোযা রাখতে একান্ত অপারগ তারা অবশ্য ফিদিয়া প্রদান করবেন। এ বছর ফিদিয়ার হার ধরা হয়েছে শহরের জামাতের জন্য কমপক্ষে ১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা এবং গ্রামের জামা'তের জন্য কমপক্ষে ১,২০০/- (এক হাজার দুইশত) টাকা।**

৫। ***তাহরিকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদে অংশ গ্রহণ:-*** আপনার জামা'তের প্রত্যেক সদস্য সদস্যাকে বিশেষ করে নওমোবাঈন বন্ধুদেরকে তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদের কল্যানময় কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করতে উৎসাহীত করুন। সকলের নিকট থেকে ২০-রমযানের মধ্যে ওয়াদা অনুযায়ী সম্পুর্ন চাঁদা আদায়ে সচেষ্ট হউন। ওয়াদা অনুযায়ী সম্পুর্ন চাঁদা পরিশোধকারীদের নামের তালিকা হুযূর (আই.) এর খেদমতে দোয়ার জন্য ২৫শে রমযানের মধ্যে অবশ্যই কেন্দ্রে পৌছানর ব্যবস্থা গ্রহন করুন।

৬। ***ফিৎরানা ও ফিদিয়া প্রদান:-*** এ বছর জামা'ত কর্তৃক ধার্যকৃত ***মাথাপিছু ফিৎরানার হার ১০০/- (একশত) টাকা, যা নবজাত শিশু থেকে পরিবারের সকলের জন্য প্রদেয়। যারা অস্বচ্ছল তারা অর্ধেক হারে ফিৎরানা দিবেন। যারা রোযা রাখতে একান্ত অপারগ তারা অবশ্য ফিদিয়া প্রদান করবেন। এ বছর ফিদিয়ার হার ধরা হয়েছে শহরের জামাতের জন্য কমপক্ষে ১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা এবং গ্রামের জামা'তের জন্য কমপক্ষে ১,২০০/- (এক হাজার দুইশত)*** টাকা। যাদের সামর্থ আছে তারা রোজা রাখা সত্ত্বেও ফিদিয়া দিতে পারেন। ২০-শে রমযানের মধ্যে ফিৎরানা, ফিদিয়া ও অন্যান্য সাহায্য খাতে আদায়কৃত চাঁদার মধ্যে বিধি মোতাবেক স্থানীয় জামা'তের অংশ হতে নিজ জামাতের গরীবদের মধ্যে বিতরণ করে অবশিষ্ট সমুদয় টাকা কেন্দ্রে প্রেরণ করবেন যাতে কেন্দ্র হতে অন্য জামাতের গরীব সদস্যদের মধ্যে তা বিতরণ করা সম্ভব হয়।

সকল স্থানীয় জামা'ত উল্লিখিত বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ ও এর অগ্রগতির সার্বিক রিপোর্ট রমযান মাস শেষ হওয়ার ৫-দিনের মধ্যে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব বরাবর প্রেরনের জন্য অনুরোধ করা হলো। যা আপনার জামা'তের পরবর্তী তরবিয়তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সহায়ক হতে পারে।

***এস, এম, আব্দুল আজিজ***
***সেক্রেটারী তরবিয়্যত***
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

# পত্র-পত্রিকার পাতা থেকে-

সংবাদ
ঢাকা : সোমবার ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২০
Dhaka : Monday 20 May 2013

## ব্লাসফেমি আইন কেন আমদানি করতে হবে

মোহাম্মদ আবদুল জলিল

ব্লাসফেমি অর্থাৎ 'ঈশ্বর নিন্দা' বা 'ধর্ম নিন্দা' বিরোধী আইন এ জন্য করা হবে যাতে কেউ মোল্লা মৌলভীদের নিন্দা করতে না পারে। সব মোল্লা মৌলভী দুধে ধোয়া ফুলের মতো পবিত্র তাই! মধ্য যুগে স্পেনে খ্রিস্টান ধর্ম যাজকদের (পাদ্রিদের) কার্যকলাপের ব্যাপারে জনগণ প্রশ্ন করত। তখন সেসব ধর্ম যাজকের (পাদ্রিদের) চাপে সরকার বাধ্য হয়ে 'ব্লাসফেমিবিরোধী আইন' অর্থাৎ 'ঈশ্বর নিন্দাবিরোধী আইন' জারি করে। স্বয়ং ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তা খ্রিস্ট ধর্মে তার নিন্দার জন্য এমন কোন আইন বা বিধি রাখেননি। খ্রিস্ট ধর্ম ছাড়া পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে কোন ধর্মেই সৃষ্টিকর্তা বা আল্লাহর নিন্দার বিরুদ্ধে কোন বিধান নেই। পাদ্রিদের চাপে এ আইন জারির ফলে ইউরোপে এবং স্পেনে শত শত লোককে মিথ্যা অজুহাতে কারাগারে বন্দী করা হয়। কাউকে কাউকে মৃত্যুদণ্ডও দেয়া হয়েছে। মূলত এ আইন খ্রিস্টান পাদ্রিদের রক্ষার জন্যই করা হয়েছিল। এ আইনটি অযৌক্তিক এবং এর অপব্যবহার হয়েছে বলে বর্তমানে ইউরোপের কোথায়ও এ আইন আর কার্যকর করা হয় না। দুঃখের বিষয় মানুষের পার্থিব জীবনে খ্রিস্টানদের বা ইউরোপের ভালো ভালো অনেক আইন আছে সেগুলোকে আমাদের দেশে যেন প্রয়োগ করতে না পারে সেজন্য আমাদের দেশের মোল্লারা ব্যাপক আন্দোলন করে।

অথচ মধ্যযুগীয়, পচা দুর্গন্ধময়, আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপিত ব্লাসফেমি আইনকে পাকিস্তানের মোল্লা মৌলভীরা কুড়িয়ে এনে পাকিস্তানে জারি করছে। এর ফলে হয়েছে কী? ১৯৭৪ সাল থেকে এখন পর্যন্ত পাকিস্তানে ব্লাসফেমি আইন প্রবর্তকেরা প্রতিদিন শুধু মোল্লা মৌলভীদের নিন্দা করার কারণে নিরীহ সাধারণ মানুষকে গ্রেফতার করে জেলে নিয়ে নির্যাতন করছে। নিত্যনৈমিত্তিক কোন না কোন মার্কেটে বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ওপরে প্রতি শুক্রবারে কোন না কোন মসজিদে 'আল্লাহু আকবর' বলে বোমা মেরে নিরীহ, নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করে চলেছে। পাকিস্তান 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি শোনা মাত্রই আশপাশের লোকজন প্রাণভয়ে দৌড়া দৌড়ি করে পালাতে থাকে, নিমিশেই দোকানপাঠ বন্ধ হয়ে যায়। জনশূন্য হয়ে যায় রাস্তাঘাট। মানুষ মনে করে, এ বুঝি বোমা ফাটল! ব্লাসফেমি আইনের মাজেজা কী ভয়ঙ্কর! একটি দেশ কীভাবে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হলো এ আইনের কারণে তার দৃষ্টান্ত পাকিস্তান। জঙ্গি, সন্ত্রাসী, ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানকেই দুনিয়ার মানুষ জানে। আমাদের এ দেশের উগ্রপন্থি মোল্লা মৌলভীরা মনে করে চোখ বন্ধ করলে বুঝি প্রলয় আসবে না!

অতীতে যেতে হবে না। চোখের সামনে এ আইনের ভয়াবহ পরিণতি আফগানিস্তানে, পাকিস্তানে প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত দেখছি। তারপরও কাদের স্বার্থে, কাদের প্ররোচনায়, কাদের বাঁচানোর জন্য এ নিকৃষ্ট আইন আমাদের মতো একটি শান্তিপ্রিয় অসাম্প্রদায়িক দেশে আমদানি করে অশান্তি সৃষ্টি করার হীন চেষ্টা। আবার দেশের সরকারকে হুমকি দিয়ে বলা হচ্ছে 'ব্লাসফেমি আইন করতে সরকারকে বাধ্য করা হবে : হেফাজত' (বাংলাদেশ প্রতিদিন ১০/৪/১৩)। ইসলামের হেফাজত আল্লাহতা'লাই করবেন এটা স্বয়ং তারই কথা। আল্লাহর চাইতে আগ বাড়িয়ে যারা বলেন তারা ইসলামকে হেফাজত করবেন নিশ্চয় তারা কি আল্লাহ উপরে? (নাউজুবিল্লা মিন জালেক) প্রকৃত অবস্থা হলো ধর্মের লেবাসধারীরা ধর্মীয়ভাবে অনভিজ্ঞ সাধারণ মানুষকে নির্যাতন করার জন্য তথাকথিত 'ঈশ্বর নিন্দার' আইন আমদানি করার অপচেষ্টা করছে। উদ্দেশ্য শান্তিতে থাকা বাংলাদেশকে আফগানিস্তান, পাকিস্তান বানানো। মোল্লা মৌলভীরা প্রকাশ্যেই স্লোগান ও সভা সমাবেশে বলে 'আমরা হবো তালেবান, বাংলা হবে আফগান'!

ইসলাম পরিপূর্ণ ধর্ম। মহানবী বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সব নবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী। 'তাঁকে সৃষ্টি করা না হলে কোন কিছুই সৃষ্টি হতো না' (হাদিস) 'ইসলাম সব ধর্মের ওপর জয়যুক্ত হবে' (সূরা আত তওবা, সূরা আল ফাতহ ও সূরা আস সাফ) তাঁর আনীত শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলামকে হেফাজত করার জন্য কোন ব্যবস্থা নেই। তাই অন্য ধর্মের থেকে ধার করে এনে যা তাদের ধর্মেও নেই সেই আইন দিয়ে সত্য ইসলামকে রক্ষা করবে, কি অদ্ভুদ দাবি! পবিত্র কোরআন পরিপূর্ণ জীবন বিধান বলে আমরা সবার মুখের ফেনা তুলে ফেলা হয় অথচ সে ইসলামকে রক্ষা করার জন্য খ্রিস্টানদের দ্বারস্থ হচ্ছে উগ্রপন্থি মোল্লারা।

যারা ব্লাসফেমি আইন চায় আমরা ইসলাম ও মহানবী (সা)-এর অবমাননা করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে বিচার দাবি করব। কারণ ব্লাসফেমি আইন চাওয়ার অর্থ ইসলাম পরিপূর্ণ ধর্ম নয়। পবিত্র কোরআন পরিপূর্ণ জীবন বিধান নয়। মহানবী বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আনীত সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বিশ্বের জন্য কেয়ামত পর্যন্ত পরিপূর্ণ জীবন বিধান নয়, তিনি সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত নন! (নাউযুবিল্লাহ) তাদের কথায়: ইসলামে নিজেকে রক্ষা করার কোন বিধান নেই! তাই 'ব্লাসফেমি আইন দিয়ে ইসলামকে রক্ষা করবে' শুধু এ অভিযোগে তাদের বিচার হওয়া প্রয়োজন। ২৫ এপ্রিল, ২০১৩ তারিখের বাংলাদেশ প্রতিদিনে '১৩ দফা দাবির ব্যাখ্যা প্রকাশ করেছে হেফাজতে ইসলাম।' তারা বলেছে 'পবিত্র কোরআন এবং হাদিসের একাধিক বাণীতে নাস্তিক মুরতাদদের ন্যায্য শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের কথা বলা হয়েছে।' দুঃখজনক হলো, ১৩ দফার ব্যাখ্যায় এ পবিত্র কোরআনের কোন কোন সূরায় এবং কোন কোন হাদিসে আছে তার নাম, আয়াত, হাদিসের নাম কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। হেফাজতে ইসলাম মনে করেছে, শুধু তারাই কোরআন পড়ে, জানে, তারা হাদিস পড়ে, জানে। তারা ছাড়া কোরআন পড়া, হাদিস পড়া আর কেউ নেই। পবিত্র কোরআনের কোথায়ও নাস্তিক, মুরতাদদের শাস্তির কথা উল্লেখ নেই। হাদিসের কোথায়ও নেই। মহানবী (সা.)-এর জীবনে বা তাঁর খলিফাদের (রা.) বা কোন একজন সাহাবার (রা.) জীবনে এমন একটিও ঘটনা নেই। বরং মক্কি ও মদিনী জীবনে মহানবীকে (সা.) অবমাননা ও নির্যাতনের অসংখ্য ঘটনা রয়েছে যার একটিরও তিনি (সা.) কোন প্রতিশোধ বা শাস্তি কিছুই দেননি। শাস্তি, প্রতিশোধ নিতে তিনি নিষেধ করেছেন। নিম্নে একটি মাত্র ঘটনা পেশ করছি। পাঠক বুঝতে পারবেন, কি অনুপম মহৎ শান্তির ধর্ম ইসলামের শিক্ষা!

মহানবী বিশ্বনবী হুযুর (সা.)-এর জীবনে ৫ম হিজরিতে বনু মুস্তালিক উত্থানের পর ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেয়া হয়। এরপর মদিনার মোনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুল প্রকাশ্যে বলেছিল, 'চল, আমরা আগে মদিনায় ফিরে যাই, তারপর মদিনার যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি, সে সেখানকার সর্বাপেক্ষা নিন্দিত ঘৃণিত ব্যক্তিকে বের করে দেবে।' সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি বলতে সে নিজেকেই বুঝিয়েছিল এবং সর্বাপেক্ষা নিন্দিত ও ঘৃণিত ব্যক্তি বলতে মহানবী হযরত মুহাম্মদকে (সা.) (নাউযুবিল্লাহে মিন জালেক)। কিন্তু, যেমনি তার মুখ থেকে ওই কথাগুলো বেরিয়েছে, আর অমনি মু'মিনরাও আসল বিষয় বুঝে ফেলল।...বিষয়টি আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সলুলের পুত্রও জানতে পারল। সে তৎক্ষণাৎ মহনবী (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল 'হে আল্লাহর রসুল (সা.) আমার পিতা আপনাকে অপমান করেছে। এর শাস্তি তো মৃত্যুদণ্ড এবং আপনার ফয়সালাও যদি তা-ই হয়, তাহলে আমি চাই যে, আপনি আমাকে আদেশ করুন, আমিই আমার পিতাকে কতল করি।' কিন্তু মহানবী বিশ্বনবী (সা.) বললেন, না তো, আমার তো এ ধরনের কোন ইচ্ছা নেই। আমি বরং তার সঙ্গে নরম ব্যবহার করব, তার ওপর দয়া করব' (ইবনে হিশাম : ২য় খণ্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা)। এই ছিল, আমাদের প্রিয় নবী মহানবী বিশ্বনবী রহমাতুললিল আল আমিন খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মহান শিক্ষা। এ মহান শান্তির ধর্ম ইসলামকে তথাকথিত ইসলামের নামে মানুষ কর্তৃক গঠিত ৭২ বা ততোধিক ইসলামী দলগুলো বা ফিরকাগুলো নিত্যনতুনভাবে ক্ষতবিক্ষত করে চলেছে।

মোল্লা মৌলভীরা যা বলবে সাধারণ মানুষ তা লুফে নেবে এমন দিন শেষ। এই মোল্লা মৌলভীরা ইংরেজি পড়া হারাম বলেছিল। এই মোল্লারা পবিত্র কোরআন বাংলা অনুবাদ করতে বিরোধিতা করেছে। এ মোল্লারা নারীদের মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তে নিষেধ করেছে। এই মোল্লারা নারী নেতৃত্ব হারাম ঘোষণা করেছে। এ মোল্লারা নির্বাচন, গণতন্ত্র সবই হারাম বলেছিল। এখন কিন্তু সব কিছু হালাল হয়েছে।

দেশের প্রগতিশীল মুক্ত চিন্তার দেশপ্রেমিক নাগরিকদের এবং যুবক ও তরুণ সমাজের কাছে বিনীত অনুরোধ অনুগ্রহ করে পবিত্র কোরআন, মহানবী বিশ্বনবী খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র জীবনী এবং ইসলামের সুমহান প্রেমপ্রীতি ভালোবাসার শিক্ষা পড়ুন এবং তা নিজেদের জীবনে রসুল (সা.)-এর সুন্নত প্রতিষ্ঠা করুন। দেখবেন আল্লাহতা'লা আমাদের এবং আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে মোল্লাদের খপ্পর থেকে রক্ষা করবেন। 'হুব্বুল ওয়াতানে মিনাল ঈমানে' দেশকে ভালোবাসা ঈমানের অঙ্গ। তখন এ মোল্লা মৌলভীরা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। শেখ সাদী বলেছেন, 'তসবিহ এবং সেজদা দেখে ইলাহি ভুলবে না, মানবসেবার কুঞ্জি ছাড়া স্বর্গ দুয়ার খুলবে না' দেশে যখনই কোন দুর্যোগ, দুর্ঘটনা ঘটে তখন তাদের উদ্ধারের জন্য, সাহায্য সহযোগিতার জন্য তথাকথিত ইসলামী দলগুলোকে সাধারণত দেখা যায় না। সেসব বিশেষ মুহূর্তে মানবতার সেবায় এগিয়ে আসে তথাকথিত 'নাস্তিকরা'! তাই দেশের মোল্লা মৌলভীদের কাছে একই সঙ্গে হেফাজতে ইসলামের কাছে অনুরোধ থাকবে, রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের চেষ্টা না করে, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা মানুষের হৃদয়ে, অন্তরে প্রেমপ্রীতি, ভালোবাসার সঙ্গে তুলে ধরুন। পুনশ্চ : ইসলাম কখনো বিপন্ন হয়নি, বর্তমানেও বিপন্ন নয়, কেয়ামত পর্যন্ত বিপন্ন হবে না। ইসলমের রক্ষক আল্লাহতা'লা চিরঞ্জিব, ইসলামও চিরঞ্জিব। মহানবী (সা)-এর আনীত শরিয়ত চিরঞ্জিব। বিপন্ন হয় ধর্ম ব্যবসায়ীরা। যখন দেখে ব্যবসা মন্দা তখনই চিৎকার করে উঠে ইসলাম গেল, ইসলাম গেল।

**ভোরের কাগজ**

ঢাকা শনিবার ১ আষাঢ় ১৪২০ • ১৫ জুন ২০১৩

# আল্লাহ জালিমদের হেদায়েত করো

শাহজাহান কিবরিয়া

২০১৩ সালের ৫ মে হেফাজতে ইসলাম নামে একটি সংগঠন ঢাকার শাপলা চত্বরে একটি মহাসমাবেশ করে। ইতোপূর্বেও তারা একবার একই স্থানে মহাসমাবেশ করেছিল। তখন সেটি ছিল শান্তিপূর্ণ। কিন্তু এবারের সমাবেশ ভিন্ন চরিত্রের।

৫ মে সকালে খবরের কাগজ পড়া শেষ করে টেলিভিশনের সামনে বসেছি হেফাজতে ইসলামীদের কর্মসূচি পালন দৃশ্য দেখার জন্য। প্রথমে ছোটখাটো দুএকটি ঘটনা ছাড়া এমন বিশেষ কিছু ছিল না। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যপট পাল্টে যেতে শুরু করে। গাড়ি ভাঙচুর, পোড়ানো শুরু হয়। পুলিশ ও র‍্যাব উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে।

শেষ বিকালের দিকে হেফাজতের কর্মীরা শাপলা চত্বর ত্যাগ করতে অস্বীকার করে এবং সেখানে অবস্থান গ্রহণ করে। তারা মঞ্চ থেকে ঘোষণা করে 'আজকের মধ্যে সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে। এরপর সরকার পালাবার পথও পাবে না।' ইতোপূর্বে বিরোধীদলীয় নেতা খালেদা জিয়া সরকারকে পদত্যাগের জন্য ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম দিয়েছিলেন। তিনি ঢাকাবাসীদের প্রতি হেফাজতিদের আশ্রয় ও আপ্যায়নের জন্যও আহ্বান জানান। হেফাজতের এসব কর্মকাণ্ডের পেছনে ছিল জামাতে ইসলামী, ইসলামী ছাত্রশিবির ও বিএনপির সক্রিয় সমর্থন।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জ্বালাও-পোড়াও দেখতে ঢাকা শহরের বাসিন্দারা কমবেশি অভ্যস্ত। দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেকে উদ্বিগ্ন থাকলেও আমার কোনো উদ্বেগ ছিল না। এ আন্দোলন সরকারের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এ দল দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের প্রতিনিধিত্ব করছে না। ইসলাম ধর্মকে সামনে রেখে ১৩ দফা দাবি পেশ করলেও ইসলামের চার মূলনীতি– নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত বাধ্যতামূলক করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব ছিল। যদিও আমরা জানি কোনো দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কোনো ধর্মীয় নীতিমালা বা ধর্মীয় বিধিনিষেধ বাধ্যতামূলক করার ব্যাপারে ইসলাম কোনো নির্দেশ দেয়নি। কেননা ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার। সুতরাং সবার ওপরে একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নীতিমালা জারি করা ন্যায়সঙ্গত নয়। ধর্মীয় বিধিনিষেধ পালনে ব্যর্থতার জন্য কেবল ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে দায়ী থাকবে, কোনো রাষ্ট্র বা সমাজ দায়ী থাকবে না। ধর্ম পালন ব্যক্তির একান্তই নিজস্ব ব্যাপার। পরের ওপর কর্তৃত্বের লোভ কিছু ব্যক্তিগোষ্ঠীকে উৎসাহিত করে। এ কারণে তারা ধর্মকে ব্যবহার করে। সন্ধ্যার পর দেখলাম সহিংসতা চরম আকার ধারণ করেছে। যত্রতত্র গাড়ি পোড়ানো, দোকানপাট পোড়ানো শুরু হয়েছে। বীভৎসতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো। বায়তুল মোকাররমের মসজিদ এলাকাসহ আশপাশে দোকানপাট পোড়ানো হচ্ছে। বইয়ের দোকানে পবিত্র কোরান শরিফও পোড়ানো হচ্ছে। ইতোপূর্বে কোনো আন্দোলনে কোরান শরিফ পোড়ানোর ঘটনা ঘটেনি। আমার উৎকণ্ঠা বেড়ে গেলো।

সারা রাত ভালো ঘুম হলো না। অস্বস্তিতে এপাশ ওপাশ করে কাটিয়ে দিলাম রাত। ঘটনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য ভোর হতেই একটা রিকশা নিয়ে বায়তুল মোকাররমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পাশে কদম ফোয়ারা চত্বরের কাছে আসতেই পুলিশ রিকশা থামালো। তোপখানা রোডের দিকে রিকশা যেতে দেবে না। পায়ে হেঁটেই রওনা দিলাম। তোপখানা রোডের কোনো ভাঙচুর বা পোড়ানোর দৃশ্য চোখে পড়লো না। বিজয়নগরের মোড়ে আসতেই দেখলাম সমস্ত রাস্তা ইটের টুকরায় ভরে আছে। বাঁ দিকে যতোদূর দৃষ্টি যায় দেখি, বিজয়নগর সড়কের সড়ক দ্বীপের সমস্ত গাছ কেটে রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

বিজয়নগর সড়কের মোড় থেকে হাউসবিল্ডিং ভবন পর্যন্ত ফুটপাতের অসংখ্য পুরোনো বই পুড়িয়ে ছারখার করা হয়েছে। পাশের ভবনগুলোতে ব্যাপক ভাঙচুর। ভবনগুলোর সমস্ত কাচ ভাঙা। কমিউনিস্ট পার্টি অফিসে আগুন দেয়া হয়েছে। আগুন দেয়া হয়েছে হাউসবিল্ডিং ভবনের নিচতলায় অবস্থিত ব্যাংক ও আজাদ প্রোডাকসের দোকানে। সমস্ত এলাকা ধোঁয়াচ্ছন্ন। পোড়া বইগুলোতে ধিকি ধিকি আগুন জ্বলছে। মসজিদের উত্তর দিকের সড়কে একটি পোড়া বাস মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

বায়তুল মোকাররমের দোকানগুলোর সামনে আসতেই মাথা ঘুরে গেলো। এ মাথা থেকে শেষ মাথা পর্যন্ত বারান্দা ও ফুটপাতের শত শত ছোট দোকান পুড়ে ছাই হয়েছে। বড় দোকানগুলোতে ভাঙচুর হয়েছে; আগুন দেয়া হয়েছে। একটি সোনার দোকান পুড়ে গেছে। বেশির ভাগ দোকানের কলাপসেবল গেট ভাঙা ও আগুনে পোড়া দাগ। সাইনবোর্ডগুলো ভাঙা এবং পোড়া।

এসব ধ্বংসলীলা দেখে মনে পড়লো একাত্তর সালের কথা। আমি তখন রাজশাহীতে কর্মরত। ঢাকায় ২৫ মার্চের ধ্বংসলীলা দেখিনি। ২৬ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা রাজশাহী পুলিশ ব্যারাক আক্রমণ করে। অপ্রস্তুত পুলিশ সদস্যরা অতর্কিত আক্রমণে মারা পড়ে। ২৭ তারিখ সকালে গিয়ে দেখি, সমস্ত এলাকায় কাপড়-চোপড়, থালাবাসন, রুটি, ভাত, তরকারি, কাঁথা বালিশ ইতস্তত ছড়ানো। কোনো কোনোটার গায়ে রক্তমাখা। এখানে ওখানে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। লাশগুলো রাতেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে। আরেকটু এগিয়ে বাম দিকে তাকাতেই দেখি, সমস্ত এলাকা ফাঁকা। এখানে অনেকগুলো বইয়ের দোকান ছিল, যার সবগুলোই ছিল ইসলাম ধর্ম বিষয়ক। এসব দোকানে শতাধিক কোরান শরিফ ও হাদিস গ্রন্থ ছিল। সমস্ত বইয়ের দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। চারদিকে পোড়া বইয়ের ধ্বংসস্তূপ। তখনো ধিকি ধিকি আগুন জ্বলছে। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। চোখ জ্বালা করছে। একটি ধ্বংসস্তূপের কাছে গিয়ে কিছু পোড়া কাগজ থেকে একটি অর্ধদগ্ধ কোরান শরিফের পাতা তুলে দেখলাম, তাতে সুরা ইয়াসিনের কিছু অংশ পড়লাম। পাশে আরো কয়েকটি অর্ধদগ্ধ কোরান শরিফ ও হাদিস গ্রন্থ। ধ্বংসযজ্ঞের মাঝে 'নতুন ধারা' নামের একটি দোকানের সাইনবোর্ড অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

অতি ছোটবেলায় আব্বার কোরান তেলাওয়াত শুনে আমার ঘুম ভাঙতো। অল্প বয়সে আমি কোরান খতম (পাঠ শেষ) করি। এ জন্য বাড়িতে খুব ভালো খাওয়া-দাওয়া হয়েছিল। কোরান শরিফকে আমরা খুব পবিত্র জ্ঞান করি। বিনা অজুতে কোরান স্পর্শ করা নিষেধ। কোরান পাঠ শেষ হলে উঁচু স্থানে রাখতাম। কোরান শরিফের দিকে পা দিয়ে শুতাম না। একবার অসাবধানতাবশত আমার হাত থেকে কোরান শরিফ মাটিতে পড়ে যায়। আমি তো ভয়ে অস্থির। আম্মা একটা বাটখারা দিয়ে মেপে কোরান শরিফের সমপরিমাণ ওজন চাল ভিক্ষুককে দান করেন। সেই কোরানের এই দুদর্শা দেখে ব্যথায় আমার বুক ভেঙে গেলো।

হযরত আলীর (রাঃ) সঙ্গে যুদ্ধে মুআবিয়া যখন হেরে যাচ্ছিল তখন মুআবিয়া বর্শার মাথায় কোরান শরিফ বেঁধে সন্ধির প্রস্তাব দেয়। বিজয় লাভের সম্ভাবনা সত্ত্বেও হযরত আলী (রাঃ) কোরান শরিফের পবিত্রতা রক্ষার্থে সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। একটি অর্ধদগ্ধ কোরান শরিফ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বুকে জড়িয়ে বাড়ি ফেরার জন্য একটি সার্ভিস বাসে উঠলাম। পোড়া কোরান শরিফের কালো কালিতে আমার জামা কাপড় কালো হয়ে গেছে।

আমার পাশে বসেছিলেন সাদা টুপি, সাদা জোব্বা পরিহিত দাঁড়িওয়ালা এক মৌলবি সাহেব। আমার জামার কালো দাগ দেখে বললেন, এগুলো কেমন করে লেগেছে। আমি বললাম, পোড়া কোরান শরিফের পাতা থেকে। তিনি অবাক বিস্ময়ে বললেন, পোড়া কোরান শরিফ! আমি জবাব দিলাম, হ্যাঁ পোড়া কোরান শরিফ, হেফাজতিরা পুড়িয়েছে। তিনি অবাক বিস্ময়ে কোরান শরিফের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'আল্লাহ তুই জালিমদের হেদায়েত কর।'

শাহজাহান কিবরিয়া : লেখক, সাহিত্যিক।

# হেফাজতে ইসলামের সেই পুরনো গীত 'ধর্মনিরপেক্ষতা মানে নাস্তিকতা'

## মাহমুদ আহমদ সুমন

বৃহস্পতিবার কালের কণ্ঠের বিশেষ সাক্ষাৎকারে তথাকথিত হেফাজতে ইসলামের আমির শাহ আহমদ শফী ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা নিঃসন্দেহে কোরআন হাদিস পরিপন্থী। তিনি ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে বলেছেন, 'ধর্মনিরপেক্ষতার মানেই হচ্ছে নাস্তিকতা। আমরা মনে করি, ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে মূলত এই দেশকে ধর্মহীন তথা নাস্তিকতার দিকে নিয়ে যাওয়ার অপচেষ্টা হচ্ছে।' পবিত্র কোরআন এবং মহানবী (সা.) সব ধর্মের অনুসারীকে নিজ নিজ রীতি অনুযায়ী ধর্মকর্ম পালন করার অনুমতি দিয়েছেন। হজরত রসুল করিম (সা.) যে ধর্মনিরপেক্ষতা কায়েম করেছিলেন তা মদিনা সনদই স্পষ্ট প্রমাণ। ধর্মনিরপেক্ষতা যদি নাস্তিকতা হয়ে থাকে তাহলে কি মহানবী (সা.) ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করে ভুল করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)? ইসলাম সম্পর্কে এ ধরনের অপবাদ দেয়া কি ইসলাম অবমাননা নয়? তিনি কীভাবে বলতে পারলেন 'ধর্মনিরপেক্ষতার মানেই হচ্ছে নাস্তিকতা'? এ ধরনের কথা কি তিনি পবিত্র কোরআনের কোন আয়াত এবং মহানবীর (সা.) হাদিস দ্বারা প্রমাণ করতে পারবেন? এরা ইসলামের হেফাজতের নামে যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে তা সম্পূর্ণভাবে ইসলাম পরিপন্থী কাজ, কারণ ইসলামের হেফাজতের মালিক হচ্ছেন একমাত্র মহান খোদাতায়ালা। যে কাজ আল্লাহর সে কাজ কোন মানুষ করা শুরু করে দিলে কি আল্লাহর সঙ্গে টেক্কা মারা হয় না (নাউযুবিল্লাহ)?

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে এদেশকে আমরা স্বাধীন করেছি। যার যার ধর্ম সে পালন করবে এই লক্ষ্যই ছিল দেশ স্বাধীনতার। আমরা জানি, ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর গণপরিষদের অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির ব্যাখ্যা প্রদান করেন। 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে তিনি বলেন-'ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। তাতে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মকর্ম করার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। আমরা আইন করে ধর্মকে নিষিদ্ধ করতে চাই না এবং করব না। মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে। তাদের বাধা দিবার মত ক্ষমতা রাষ্ট্রের কারও নেই। হিন্দুরা তাদের ধর্ম পালন করবে, তাদের কেউ বাধা দিতে পারবে না। আমাদের শুধু আপত্তি হলো, ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না। ২৫ বছর আমরা দেখেছি ধর্মের নামে জুয়াচুরি, ধর্মের নামে বেইমানি, ধর্মের নামে অত্যাচার, খুন, ব্যভিচার বাংলাদেশের মাটিতে চলেছে। ধর্ম অতি পবিত্র জিনিস। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না। যদি কেউ বলে যে, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে। আমি বলব, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়নি। সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্মীয় অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করেছি।' (তথ্য-'বঙ্গবন্ধু ও ইসলামী মূল্যবোধ' পুস্তক-পৃষ্ঠা-৮-১২)

ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে ঐতিহাসিক ৭ জুন উপলক্ষে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন 'বাংলাদেশের মুসলমান মুসলমানের ধর্ম পালন করবে। হিন্দু তার ধর্ম পালন করবে। বৌদ্ধও তার নিজের ধর্ম পালন করবে। এটিতে ধর্মহীনতা নাই, ধর্ম নিরপেক্ষতা আছে। এর একটা মানে আছে। এখানে ধর্মের নামে ব্যবসা করা চলবে না। ধর্মের নামে মানুষকে লুট করে খাওয়া চলবে না। ধর্মের নামে রাজনীতি করে রাজাকার আলবদর পয়দা করা বাংলার বুকে আর চলবে না। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করতে দেয়া হবে না' (বঙ্গবন্ধু ও ইসলামী মূল্যবোধ)।

এত বছর অতিক্রম করার পরেও এদেশের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ করা হয়। তাদের উপাসনালয় জালিয়ে দেয়া হয় আর বলা হয় 'ধর্মনিরপেক্ষতার মানেই হচ্ছে নাস্তিকতা'। এটা ইসলাম নয়। যারা আজকে ধর্মের লেবাস ধারণ করে ইসলামের কথা বলছে তাদের মাঝে প্রকৃত ইসলামের কোন শিক্ষা নেই। তথাকথিত জঙ্গি সংগঠন হেফাজতে ইসলাম নাম ধারণ করে সহজ-সরল লোকদের ঈমান নষ্ট করার জন্য এবং দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার লক্ষ্যেই তারা মাঠে নেমেছে এছাড়া আর কিছু নয়।

ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব হলো, এটা প্রত্যেক মানুষকে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করে। এই স্বাধীনতা কেবল ধর্ম-বিশ্বাস লালন-পালন করার স্বাধীনতা নয় বরং ধর্ম না করার বা ধর্ম বর্জন করার স্বাধীনতাও এই ধর্মীয় স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা বলেছেন, 'তুমি বল, তোমার প্রতিপালক-প্রভুর পক্ষ থেকে পূর্ণ সত্য সমাগত, অতএব যার ইচ্ছা সে ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছা সে অস্বীকার করুক' (সূরা কাহাফ : ২৮ আয়াত)। সত্য ও সুন্দর নিজ সত্তায় এত আকর্ষণীয় হয়ে থাকে যার কারণে মানুষ নিজে নিজেই এর দিকে আকৃষ্ট হয়। বলপ্রয়োগ বা রাষ্ট্রশক্তি নিয়োগ করে সত্যকে সত্য আর সুন্দরকে সুন্দর ঘোষণা করানো অজ্ঞতার পরিচায়ক। ফার্সিতে বলা হয়, সূর্যোদয়ই সূর্যের অস্তিত্বের প্রমাণ। এই নিয়ে গায়ের জোর খাটানোর বা বিতণ্ডার অবকাশ নেই। সূর্যোদয় সত্ত্বেও কেউ যদি সূর্যের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তাকে বোকা বলা যেতে পারে কিন্তু তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার কিছুই নেই। ঠিক তেমনি কে আল্লাহকে মানল বা মানল না, কে ধর্ম করল বা করল না এটা নিয়ে এ জগতে বিচার বসানোর কোন শিক্ষা ইসলাম ধর্মে নেই। বরং এর বিচার পরকালে আল্লাহ নিজে করবেন বলে তার শেষ শরিয়ত গ্রন্থ আল কোরআনে বার বার জানিয়েছেন। এ স্বাধীনতা কাজে লাগিয়ে সমাজে আস্তিকও থাকবে, নাস্তিকও থাকবে। মুসলমানও থাকবে হিন্দুও থাকবে এবং অন্য মতাবলম্বীরাও থাকবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র পরিচালনা করার ইসলামী শিক্ষা কী আর ধর্মনিরপেক্ষতা প্রসঙ্গে ইসলাম কী বলে তাও জানা প্রয়োজন।

ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্র পরিচালনার একটি নীতি। এর অর্থ ধর্মহীনতা বা ধর্মবিমুখতা নয়। এর অর্থ হচ্ছে, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নায়করা নাগরিকদের ধর্ম বা বিশ্বাসের বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকবেন। কে কোন ধর্মে বিশ্বাসী বা কে অবিশ্বাসী অথবা নাস্তিক এ বিষয়ে রাষ্ট্র-যন্ত্র কোন ধরনের হস্তক্ষেপ করবে না। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব নাগরিকের সমান অধিকার, সবাই রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে সমান- এই হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা।

পূর্ণ নিরপেক্ষতা ছাড়া পক্ষপাতহীন ন্যায়বিচার সম্ভব নয়। ইসলাম ধর্মের এই অমোঘ শিক্ষার বাস্তব প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই মহানবী হজরত মুহাম্মদের (সা.) পবিত্র জীবনে। মক্কার নির্যাতিত অবস্থা থেকে মুক্তি চেয়ে ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভের প্রত্যাশায় তিনি মদিনায় হিজরত করেন। মদিনায় পৌঁছানোর পর মদিনার ইহুদি ও অন্যান্য ধর্ম গোষ্ঠী ও গোত্রের সঙ্গে তিনি একটি 'সন্ধি' করেন। এই সন্ধি 'মদিনা সনদ' নামে বিখ্যাত। 'মদিনা সনদের' প্রতিটি ছত্রে সব ধর্মের ও বর্ণের মানুষের সমান নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। মদিনা রাষ্ট্রের সব নাগরিককে এক জাতিভুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মদিনা সনদের ২৫ নম্বর ধারায় ধর্মনিরপেক্ষতার একটি বিরল উদাহরণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এতে বলা হয় : বনু আঁওফ গোত্রের ইহুদিরা মুমিনদের সঙ্গে একই উম্মতভুক্ত বলে গণ্য হবে। ইহুদিদের জন্য ইহুদিদের ধর্ম, মুসলমানদের জন্য মুসলমানদের ধর্ম। একই কথা এদের মিত্রদের এবং এদের নিজেদের জন্য প্রযোজ্য। তবে যে অত্যাচার করবে এবং অপরাধ করবে সে কেবল নিজেকে এবং নিজ পরিবারকেই বিপদগ্রস্থ করবে।

কী চমৎকার শিক্ষা! বিশ্বনবী, মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) প্রতিষ্ঠিত নীতি হলো, যে যে ধর্মেরই হোক না কেন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তাদের জাগতিক অবস্থান সমান। এটি নিছক একটি ঘোষণাই ছিল না। বরং মহানবী (সা.) মদিনার শাসনকাজ পরিচালনাকালে এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নও করেছিলেন। একবার মহানবীর (সা.) শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় নিয়ে একজন মুসলমান ও একজন ইহুদির মাঝে বাকবিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে বিতণ্ডা তিক্ততার স্তরে উপনীত হলে সেই ইহুদি মহানবীর (সা.)' কাছে বিচারপ্রার্থী হয়। মহানবী (সা.) নিরপেক্ষ শাসক হিসেবে রায় দিয়ে বলেন, তোমরা আমাকে মুসার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করো না (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া লে ইবনে কাসীর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩৭)। এর অর্থ হচ্ছে, আধ্যাত্মিক জগতে কে শ্রেষ্ঠ আর কে শ্রেষ্ঠ নয় এটা মানুষের সিদ্ধান্তের বিষয় নয়। অতএব এ নিয়ে সামাজিক অশান্তি সৃষ্টি করতে যেও না। ধর্ম বিষয়ে নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা ইসলামের শিক্ষানুযায়ী দ্ব্যর্থহীনভাবে সাব্যস্ত।

পরিশেষে বলব, ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে তথাকথিত হেফাজতের আমির যে মন্তব্য করেছেন তা ইসলাম পরিপন্থী। যারা কোরআন ও আল্লাহ রসুলের শিক্ষা পরিপন্থী কথা বলে তারা আবার কী করে ইসলামের হেফাজতকারী হতে পারে? আর ইসলামের হেফাজতকারী তো হলেন স্বয়ং আল্লাহতায়ালা। আল্লাহ আমাদের তথাকথিত এই হেফাজতের কবল থেকে মানুষকে রক্ষা করুন এই দোয়াই করি।

[লেখক : প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট]
masumon83@yahoo.com

সংবাদ
ঢাকা : মঙ্গলবার ২৬ চৈত্র ১৪১৯
Dhaka : Tuesday 9 April 2013

সংবাদ

ঢাকা : মঙ্গলবার ২৬ চৈত্র ১৪১৯
Dhaka : Tuesday 9 April 2013

সম্পাদকীয়

## হেফাজতে ইসলামের ১৩ দফা রাষ্ট্রকে তালেবান করার দাবি

গত শনিবার রাজধানীতে এক সমাবেশ থেকে হেফাজতে ইসলাম ১৩ দফা দাবি উত্থাপন করেছে। কথিত নাস্তিক-ব্লগারদের কঠোর শাস্তি, ইসলাম অবমাননা প্রতিরোধে মৃত্যুদণ্ডের বিধান সংবলিত আইন প্রণয়ন, নারীনীতি ও শিক্ষানীতি বাতিলের মতো দাবি তাদের ১৩ দফায় অন্তর্ভুক্ত অন্যতম দাবি। হেফাজতে ইসলামের আমির আল্লামা শাহ আহমদ শফী বলেন, এসব দাবি কোন রাজনৈতিক দাবি নয়। তাদের বেঁধে দেয়া দাবি আদায় না হলে ৫ মে ঢাকা অবরোধ করা হবে বলে জানিয়েছে ধর্মভিত্তিক সংগঠনটি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, এসব দাবি সরকারের সংশ্লিষ্ট পর্যায়ে যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে।

হেফাজতে ইসলামের ১৩ দফা অবশ্যই রাজনৈতিক দাবি এবং বেশিরভাগই অযৌক্তিক, অগণতান্ত্রিক এবং বর্বর মধ্যযুগীয় দাবি। বাংলাদেশকে তালেবান রাষ্ট্র বানানোর দাবি। তাদের সবচেয়ে বড় যে দাবি সেটি হচ্ছে নাস্তিকদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া। এটি একটি বিবেচনাবর্জিত দাবি। সাধারণ বিচারে একজন নাস্তিকের কোন ধর্মবিশ্বাস থাকে না। নাস্তিক অর্থ ইসলামবিদ্বেষী বা ধর্মবিদ্বেষী– এমন ধারণার ভিত্তি নেই। নাস্তিক্য কোন বিদ্বেষের বিষয় নয়, বিশ্বাসের বিষয়। একজন মানুষ কী বিশ্বাস করবে না করবে সেটি একান্তই তার ব্যক্তিগত এখতিয়ার। এখানে রাষ্ট্র বা কোন গোষ্ঠী তো দূরের কথা সেই ব্যক্তির পরিবার বা স্বজনরাও খবরদারি চালাতে পারে না বা বিশেষ কোন বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য জবরদস্তি করতে পারবে না। একজন মানুষ স্বাধীনভাবে যেমন ইসলাম, সনাতন ধর্ম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, জৈন প্রভৃতির যেকোন একটিতে বিশ্বাস করতে পারে, তেমন এর কোনটিতেই বিশ্বাস নাও করতে পারে। তাই বলে একজন ধর্মে অবিশ্বাসী লোককে মেরে ফেলতে হবে তা সমর্থনযোগ্য নয়। নাস্তিক বা ধর্মে অবিশ্বাসীদের মৃত্যু দাবি করেনি দেশের হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের কেউ। এমনকি ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সবাই যে নাস্তিকের ফাঁসি চেয়েছে তাও নয়। কেবল হেফাজতে ইসলাম এবং ইসলামভিত্তিক কিছু কট্টর গোষ্ঠী এই দাবি তুলছে। এছাড়া ইসলাম ধর্মের কোথাও নাস্তিকদের মেরে ফেলা বা ফাঁসি দেয়ার কথা বলা নেই।

বিশ্বে অনেক ইসলামী রাষ্ট্র আছে বা সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী এমন রাষ্ট্রও রয়েছে। কিন্তু কোন ইসলামী রাষ্ট্রকে নাস্তিক খুঁজে খুঁজে ফাঁসি দিতে দেখা যায়নি। মনে রাখতে হবে বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। এখানে কট্টর কোন গোষ্ঠীর বিবেচনাবর্জিত দাবি মানার সুযোগ নেই। গণতান্ত্রিক দেশে এককেটি দল নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে, সেই ইশতেহারের ভিত্তিতে জনগণ তাদের ভোট দেয় এবং জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করে। কোন গোষ্ঠীর ১৩ দফা মানা না মানার ওপর সরকার গঠন বা পতন নির্ভর করে না।

অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনে গঠিত একটি গণতান্ত্রিক সরকার নারীনীতি ও শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছে। সরকারের প্রণীত নীতিকে ব্যাপক জনগোষ্ঠী স্বাগত জানিয়েছে। একটি গণতান্ত্রিক সরকারের প্রণীত নীতি বাতিলের দাবি নির্বাচিত সরকারকেই আক্রমণের শামিল। সংসদীয় গণতন্ত্রে জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়ন করেন জননির্বাচিত প্রতিনিধিরা। আইন প্রণয়ন বা বাতিলের সঙ্গে কেবল কোরআন-হাদিসই নয় বিশ্বের আর কোন ধর্মের কোন যোগসূত্র নেই। কাজেই হেফাজতে ইসলাম কোরআন-হাদিস বিরোধী আইন বাতিলের যে দাবি করেছে তা অবান্তর এবং সমর্থনযোগ্য নয়।

নারী-পুরুষ প্রকাশ্যে অবাধ বিচরণ করবে নাকি অপ্রকাশ্যে অবাধ বিচরণ করবে সেটি কোন গণতান্ত্রিক সরকার ঠিক করে দিতে পারে না। হেফাজতে ইসলাম গণতান্ত্রিক সরকারের কাজের এখতিয়ার না জেনেই উদ্ভট সব দাবি তুলেছে। মোম জ্বালানো বা ভাস্কর্য স্থাপন সেক্যুলার বাঙালির সংস্কৃতি। প্রত্যেক গোষ্ঠীকেই তার সংস্কৃতি নিয়ে থাকতে দিতে হবে এবং অন্যের সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা জানাতে হবে।

হেফাজতে ইসলামের ১৩ দাবির মধ্যে কেবল গোটা দুয়েক দাবি বিবেচনাযোগ্য। কোন আলেম-ওলামা বা মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে যদি মিথ্যা মামলা করা হয় বা অযৌক্তিকভাবে গ্রেফতার করা হয় তবে সেসব মামলা প্রত্যাহার বা গ্রেফতারকৃতদের মুক্তির দাবিটি সরকার বিবেচনা করে দেখতে পারে। কওমি মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের কেউ যদি হুমকি দিয়ে থাকে বা দমন-পীড়ন চালায় তবে তার বিরুদ্ধে সরকার ব্যবস্থা নিতে পারে। যে কারও যেকোন গণতান্ত্রিক দাবি সংবিধান ও আইন অনুযায়ী মানা যায়। কিন্তু অগণতান্ত্রিক, অমানবিক এবং তালেবানি দাবি মেনে নেয়া উচিত নয়।

সংবাদ

ঢাকা : সোমবার ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪২০
Dhaka : Monday 20 May 2013

রংপুরে চরমোনাই পীর

## যারা কোরআন পুড়িয়েছে তারা মুসলমান হতে পারে না

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

ইসলামী আন্দোলনের আমির মুফতি সৈয়দ রেজাউল করীম পীর সাহেব চরমোনাই বলেছেন যারা পবিত্র কোরান শরীফ পুড়িয়েছে তারা মুসলমান হতে পারে না। তিনি বলেন ওই দিন হেফাজতে ইসলামকে যারা ব্যবহার করেছে ধোঁকা দিয়েছে ওদের ধরেন গ্রেফতার করে বিচার করেন। দেশের মানুষ সরকারকে এ কাজে সমর্থন দেবে।

তিনি গত শুক্রবার বিকেলে রংপুর জিলা স্কুল মাঠে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে আয়োজিত জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে একথা বলেন। তিনি বলেন সেদিন যারা পবিত্র কোরান শরীফ পুড়িয়েছে তাদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। তবে হেফাজতে ইসলামের লোকজন না অন্য কেউ এ কাজ করেছে তা তদন্ত করার দাবি জানান তিনি।

চরমোনাই পীর বলেন যেসব নাস্তিক মহান আল্লাহ এবং রাসুলের অবমাননা করেছে তারা কোন মুসলমান নয়, ওরা কাফের, তাদের কঠোর শাস্তি দেয়ার জন্য জাতীয় সংসদে আইন পাস করতে হবে।

ভোরের কাগজ ■ শনিবার ■ ১৫ জুন ২০১৩

## জামাত ইসলামের দুশমন গণতন্ত্রের শত্রু

——— স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

**রফিকুল ইসলাম সুইট, পাবনা থেকে :** স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এড. শামসুল হক টুকু বলেছেন, জামাত-হেফাজতে ইসলাম ধর্মের নামে দেশে মুসলমানদের মধ্যে ফেতনা এবং বিভেদ সৃষ্টি করছে। জামাতে ইসলামী '৭১ সালে ধর্মের নামে মানুষ হত্যা, ধর্ষণে সহায়তা ও ধর্ষণ করেছিল। এখন যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচানোর জন্য নানা অরাজনৈতিক কাজকর্ম করে যাচ্ছে। হেফাজতে ইসলাম ৫ তারিখে কুরআন শরিফ পুড়ানো, মসজিদে আগুন দেয়াসহ যে সকল তুলকালাম ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছিল, এতে তারা ইসলাম ও গণতন্ত্রের দুশমন হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। ইসলামের নামে স্লোগান দিলেও তারা ইসলামের দুশমন। তারা গণতন্ত্রের শত্রু। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিনাশকারী

# সংবাদ

## সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপিত মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

গত ১৫ জুন শনিবার বাদ মাগরিব বাংলাদেশের প্রথম আহমদীয়া মসজিদ 'মসজিদুল মাহ্‌দী'তে জনাব এস,এম, ইব্রাহীম রিজিওনাল কায়েদ এর সভাপতিত্বে সীরাতুন নবী (সা.) জলসার কার্যক্রম শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াতের পর নযম উর্দু পেশ করেন জনাব এস, এম, সামী। প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব এনাম এলাহী শুভ। বক্তৃতা পর্বে 'শানে নবীজি (সা.)'-এর ওপর বক্তৃতা করেন মৌলবী আসাদুল্লাহ্ আসাদ, 'ইসলামের ইতিহাসে বিদায় হজ্জের ভাষণ ও এ থেকে মুসলিম উম্মাহর শিক্ষা' এ বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন মওলানা শামসুদ্দিন মাসুম, 'আহমদী মুসলমানদের দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব এখতিয়ার উদ্দিন শুভ। এরপর বাংলা নযম পেশ করেন জনাব কুদ্দুস উল্লাহ্ সিকদার। এরপর সভাপতি হযরত রসূল করীম (সা.) এর ওপর অবমাননার নিন্দা, কুরআন ও ইতিহাসের যুক্তিতে রসূল (সা.) এর মর্যাদা এবং আমাদের করণীয় বিষয়গুলো উপস্থাপন করে সমাপনী বক্তব্য রাখেন। এরপর প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। জলসা এবং প্রশ্নোত্তর পর্বে ৫ জন অ-আহমদী মেহমানসহ মোট ৫২ জন উপস্থিত ছিলেন। প্রশ্নোত্তর পর্বে অ-আহমদী মেহমানদের রসূল (সা.)কে নিয়ে অবমাননাকর চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রতিবাদে হুযুর (আই.)-এর ২১ শে সেপ্টেম্বর ২০১২ সালের জুমুআর খুতবা সংক্রান্ত লিফলেট এবং ক্যাপিটাল হিলে হুযূরের ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করা হয়। দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

*রায়হান আহমদ রুদ্র*

## বগুড়া

গত ৩১ মে ২০১৩ তারিখে বগুড়া জামা'তের উদ্যোগে খেলাফত দিবস উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। দিবসের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব রবিউল আলম মমিন ও নযম পেশ করেন পর্দার অন্তরাল থেকে একজন লাজনা সদস্যা। আলোচনা সভায় দিবসের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন জনাব আব্দুল্লাহ্ আহমদ, মৌ. আব্দুস সালাম, মোয়াল্লেম এবং জনাব ফিরোজ আহমদ। আলোচনা সভায় লাজনা ও নাসেরাতসহ মোট ২৫/৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

*আফতাব আহমদ*

## লাজনা ইমাইল্লাহ্, চট্টগ্রাম

গত ৩১ মে লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের উদ্যোগে খেলাফত দিবস পালন করা হয়, উক্ত দিবসে সভাপতিত্ব করেন নিলুফার মমতাজ। কুরআন তেলাওয়াত করেন মামদুদা খালিদ, দোয়া পরিচালনা করেন সভানেত্রী। হাদীস পাঠ করেন ফাতেমাতুজ জোহরা। নযম পাঠ করেন ফারিহা ফাইরুজ। বক্তৃতা পর্বে: যুগ খলীফার আনুগত্য বিষয়ে বক্তৃতা করেন–আমাতুস সামী তাহেরা। খেলাফত দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন লিজা আক্তার। খলীফা আল্লাহ্ নির্বাচন করেন এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন নাঈমা বুশরা। এছাড়া নযম পেশ করেন আমাতুস সামী তাহেরা ও আমাতুল সামী অদিতি এবং হেবাতুন নূর। উক্ত খেলাফত দিবসে ৬৮ জন লাজনা এবং ৩০ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন ।

*রোকসানা বেগম*

## লাজনা ইমাইল্লাহ্, নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্র উদ্যোগে গত ০৭-০৬-২০১৩ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ খেলাফত দিবস সফলতার সাথে পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। স্থানীয় মজলিসের প্রেসিডেন্ট মাসুদা পারভেজ এর সভানেত্রীত্বে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। পবিত্র কুরআন ও বাংলা তরজমা পাঠ করেন হামিদা খায়ের। বাংলা ও উর্দু নযম আবৃত্তি করেন সুরাইয়া নাসের তুলি, খাওলাদ্বীন উপমা ও মরিয়ম সিদ্দিকা। অত:পর বক্তৃতা পর্বে: খেলাফত একটি বরকতপূর্ণ সংগঠন– এ বিষয়ে উম্মে কুলসুম চায়না, খেলাফত ছাড়া আধ্যাত্মিক উন্নতি হতে পারে না-এ বিষয়ে ফারহানা চৌধুরী, খেলাফতের আনুগত্য– সম্পর্কে আমতুন নূর (মুন্নি) এবং খেলাফতের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা–সম্পর্কে ফারহানা আক্তার বক্তব্য রাখেন। সভানেত্রীর ভাষণ এবং ইজতেমায়ী দোয়ার উক্ত দিবসের সমাপ্তি হয়। এতে ৩৪ জন উপস্থিত ছিলেন।

*উম্মে কুলসুম চায়না*

## জামালপুর (হবিগঞ্জ)

গত ০১/০৬/২০১৩ বাদ জুমুআ অত্যন্ত সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে খেলাফত দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত দিবসে সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম। প্রথমে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব সোহাগ আহমদ চৌধুরী, নযম পাঠ করেন জনাব স্বাধীন আহমদ চৌধুরী। এরপর খেলাফত দিবস সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেন সর্বজনাব লিটন আহমদ চৌধুরী, ডা: রফিক আহমদ চৌধুরী, কবির আহমদ চৌধুরী এবং সর্বশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। এতে মেহমানসহ ৩২ জন উপস্থিত ছিলেন।

*মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম*

## মাহিগঞ্জ

গত ২৭শে মে ২০১৩ তারিখ রোজ সোমবার বাদ মাগরীব, মাহিগঞ্জ জামা'তের উদ্যোগে খেলাফত দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ খালেদুল ইসলাম। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ আওলাদ হোসেন এরপর দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি। নযম পাঠ করেন জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন। এরপর খেলাফত দিবসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করেন জনাব মোহাম্মদ খালেদুল ইসলাম, মোহাম্মদ শাহাদত হোসেন, মৌ. এস,এম রাশিদুল ইসলাম এবং মোহাম্মদ মোশারফ মিয়া প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৭৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

*মোহাম্মদ রাশিদুল ইসলাম*

## নূরনগর/ঈশ্বরদী

গত ৩১/০৫/২০১৩ তারিখে খেলাফত দিবস পালন করা হয়। ঐদিন জুমুআর নামাযের পর দিবসের আলোচনা শুরু করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন হতে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন। এরপর নযম পাঠ করেন জনাব মোহাম্মদ মুক্তার হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মুহাম্মদ আশরাফ আলী খান। দোয়ার মাধ্যমে আলোচনা পর্বের কাজ শুরু করা হয়।

এতে খেলাফতের কল্যাণ, গুরুত্ব ও তাৎপর্যের ওপর আলোচনা করেন যথাক্রমে সর্বজনাব মোহাম্মদ ফজলুল হক, মুহাম্মদ আফতাব উদ্দিন, মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, মুহাম্মদ মুক্তার হোসেন, মুহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন ও মুহাম্মদ হানিফ আহমদ। পরিশেষে সভাপতির সমাপ্তি বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে ১৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

*মুহাম্মদ আশরাফ আলী খান*

## লাজনাইমাইল্লাহ নূরনগর/ঈশ্বরদী

নূরনগর লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে গত ২৯/০৫/২০১৩ তারিখে খেলাফত দিবস পালিত হয়। উক্ত দিবসে উপস্থিত ছিলেন লাজনা ৮ জন, নাসেরাত ২ জন। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করা হয়। খলীফা কখনো পদচ্যুত হন না, এ বিষয়ে আলোচনা করেন মতজারা বেগম। খিলফতের আনুগত্য হৃদয়গ্রাহী ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেন লাভলী জামান।

আহমদীয়া খিলাফতের মাধ্যমেই ইসলামের বিশ্ববিজয় এর ওপর আলোচনা করেন আফছানাআরা। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্মের ওপর আলোচনা করেন মাহমুদা জাহান জান্নাত। খলীফার আনুগত্য ও শ্রেষ্ঠত্বের ওপর আলোচনা করেন মেরীনা খাতুন। সর্বশেষে প্রেসিডেন্টের দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

*রওশনয়ারা*

## ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দিনব্যাপী ব্লাড গ্রুপ নির্ণয় কর্মসূচী

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে এবং মোহতরম আমীর সাহেবের সদয় অনুমোদন ও নির্দেশনায় বাংলাদেশের মজলিসের ব্যবস্থাপনায় গত ১৪ জুন, ২০১৩ তারিখ রোজ শুক্রবার দিনব্যাপী ব্লাড গ্রুপ নির্ণয় কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। সকাল ৯-৪৫ মি. সর্বপ্রথম উত্তর আহমদী পাড়া হালকায় মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদে-এ মোহতামীম খেদমতে খালক সাইদুর রহমানের নেতৃত্বে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় শুরু হয়। এ সময় সফর সঙ্গী মোহতামীম ইশায়াত মঞ্জুর আহমদসহ দক্ষ তিনজন টেকনিশিয়ান এবং কায়েদ, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া উপস্থিত ছিলেন। একই টিম বেলা চার ঘটিকায় দেড় কি. মি. দূরে ভাদুঘর হালকায় ব্লাড গ্রুপ পরীক্ষা করেন। এসময় সেখানে যোগ দেন মওলানা শামসুদ্দিন মাসুম। এরপর এই টিম বিকাল ৬ টায় মৌড়াইল হালকা মসজিদে ব্লাড গ্রুপ নির্ণয় করেন। মজলিসের সকল সদস্যের নিকট সুবিধা পৌঁছে দিতে মজলিসের ৩টি হালকায় ব্লাড গ্রুপ পরীক্ষা করা হয়। ৩টি হালকায় ২২ জন নন-আহমদী শুভাকাঙ্খীসহ ১৮৩ জন সদস্যের ব্লাড গ্রুপ পরীক্ষা করা হয়, পরবর্তীতে আরো ৪১ জন সর্বমোট ২২৪ জন সদস্যের রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করা হয়। ভবিষ্যতে স্বেচ্ছায় মানবতার সেবায় রক্ত দান উক্ত কর্মসূচি ও প্রণীত তালিকা জোরালো ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা আশা করি।

*মেহেদী হাসান পায়েল*

## উথলী

গত ২৭ মে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত উথলীর মসজিদ প্রাঙ্গনে বাদ আসর জনাব আবুল হায়াত বিশ্বাস প্রেসিডেন্ট এর সভাপতিত্বে খেলাফত দিবসের আয়োজন করা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মুয়াযযেম আহমদ সানী, কায়েদ, উথলী মজলিস, নযম পাঠ করেন জনাব শাহিনুর রহমান, যয়ীম, উথলী মজলিস। খেলাফত দিবসের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন জনাব তারেক আহমদ, জেলা কায়েদ।

খেলাফত কি খেলাফতের আনুগত্য ইত্যাদি বিষয়ে কুরআন হাদীসের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করেন মৌ. মোজফফর আহমদ রাজু, মোয়াল্লেম, উথলী। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

*মুয়াযযেম আহমদ সানী*

## কটিয়াদী

গত ৩১-০৫-২০১৩ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কটিয়াদীর উদ্যোগে খেলাফত দিবসের ওপর আলোচনা করা হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব এম, এ হান্নানের সভাপতিত্বে খেলাফত দিবসের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব কারী মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিক, নযম পাঠ করে মোহাম্মদ সাদিব, বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব আব্দুল হামিদ ভূইয়া, এডভোকেট মোহাম্মদ আজিজুল হক, মোহাম্মদ রুহুল আমীন। নযম পাঠ করেন তানহা ও মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান। সভাপতির ইজতেমায়ী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শেষ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন তার মধ্যে নওমোবাঈন ৮ জন।

*মোহাম্মদ রুহুল আমীন*

## লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঘাটুরায় মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালিত

গত ১৩/০৪/২০১৩ তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঘাটুরার উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস সফলতার সাথে পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত দিবসে সভাপতিত্ব করেন মরিয়ম ছিদ্দিকা, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, ঘাটুরা। কুরআন তেলাওয়াত করেন ঝুমারা জান্নাত, নযম পেশ করেন সায়েমা আহমদ ও পলি হাজারীকা। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর ওপর বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন মুবাশ্বেরা সেলিম, আইরিন বেগম, রহিমা নাজীম এবং কাজল রেখা। বাংলা নযম পেশ করেন রহিমা বেগম, শারমিন শিমুল এবং ইসরাত জাহান ইভা। সভাপতির সমাপনী বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ২৮ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

*মরিয়ম ছিদ্দিকা*

## লাজনা ইমাইল্লাহ্, আহমদনগর

গত ৩১/০৫/২০১৩ লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে খেলাফত দিবস উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত দিবসে কুরআন তেলাওয়াত করেন আমাতুস সামী, হাদীস পাঠ করেন ফারজানা শাওন। অমৃতবাণী পাঠ করেন কামরুন্নাহার মাহমুদ। নযম পাঠ করেন রিজুয়ানা করিম।

বক্তৃতা পর্বে ঐশী খেলাফতের গুরুত্ব, খেলাফতের কল্যাণ, খলীফার আনুগত্য সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য প্রদান করেন আফরোজা মতিন, তাসলিমা ওয়ায়েজুল্লাহ্ এবং বিলকিস তাহের।

সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে উক্ত খেলাফত দিবসের সমাপ্তি হয়। এতে ৪৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

## তবলিগী আশারা

গত ১৬ই জুন হতে ২৪শে জুন (২০১৩) পর্যন্ত ১০ দিন লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরে বিশেষ তবলিগী আশারা পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

উক্ত সময়ে মোট ১৯৮ জনকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বাণী পৌঁছানো হয় এবং ৩৫ কপি লিফলেট বিতরণ করা হয়।

## তবলিগী সভা

গত ১৭ জুন ২০১৩ লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে পঞ্চগড়ের ভাবরঙ্গি গ্রামে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তবলিগী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুল্লিাহ।

উক্ত তবলিগী অনুষ্ঠানে মোট ২৬জন জেরে তবলীগ এতে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া গত ০৯ই জুন ২০১৩ তারিখে শাকোয়া গ্রামে তবলিগী অনুষ্ঠিত হয়। তবলিগী অনুষ্ঠানে ৬ জন হিন্দুসহ ২০ জন জেরে তবলীগ ও ৭ জন লাজনা বোন উপস্থিত ছিলেন।

## তালিম তরবিয়তী ক্লাস

গত ১৫ মে ২০১৩ লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরে দু'দিন ব্যাপী তালিম তরবিয়তী ক্লাস অত্যন্ত সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে ইসলামী বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হয়। ক্লাসে ৮০ জন লাজনা ও ২০ নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়া গত ২৫ মে ২০১৩ লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে নাসেরাতদের তালিম তরবিয়তী ক্লাস দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রতিযোগিতা নেয়া হয় এবং পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এতে ৪২ জন উপস্থিত ছিলেন।

*মিলা পাটোয়ারী*

## মিরপুরে ৪র্থ ওয়াকফে নও ক্লাস ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ১৮ জুন ২০১৩ হতে ২২ জুন ২০১৩ পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, মিরপুরের উদ্যোগে পাঁচ দিনব্যাপী "৪র্থ ওয়াকফে নও ক্লাস ও সম্মেলন ২০১৩" অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোহতরম মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ, বাংলাদেশ এবং বি. আকরাম আহমদ খান চৌধুরী, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, মিরপুর। আরও উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও জনাব হালিম আহমদ হাজারী। উক্ত ক্লাস ও সম্মেলনে ওয়াকফে নও এবং তাদের মাতা-পিতা স্বত:স্ফুর্তভাবে ৫ দিন ব্যাপী অংশগ্রহণ করেন। এতে মোট ৪৩ জন ওয়াকফে নও ও ৪৫ জন মাতা-পিতা অংশগ্রহণ করেন। ১৮ জুন থেকে ২০ জুন হুযূর (আই.)-এর ১৮ই জানুয়ারী ২০১৩ এর খুতবার উপর ক্লাস নেয়া হয়। ক্লাসে খুতবায় উদ্ধৃত কুরআনের আয়াতগুলোর অর্থ ওয়াকফে নওদের শেখানো হয় এবং সম্পূর্ণ খুতবা ও মূল খুতবা থেকে ওয়াকফে নও ও পিতা-মাতাদের অংশ আলাদা করে সরবরাহ করা হয়। নির্ধারিত ক্লাস শেষে শুক্রবার ২১ জুন কুরআন তেলাওয়াত, নযম ও হুযূরের খুতবার ওপর লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ২২ জুন বাদ মাগরিব সমাপনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

*মুনাদিল ফাহাদ*

## রাজশাহী-১ এর ১৫তম বিভাগীয় ওয়াকফে নও সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ০৪-০১-২০১৩ তারিখ রোজ শুক্রবার বিকাল ৩ ঘটিকায় ৫ দিনব্যাপী ওয়াকফে নও সম্মেলন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, আহমদনগরে মোহতরম হালিম আহমদ হাজারী, ন্যাশনাল ওয়াকফে নও সেক্রেটারীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন জনাব মাহমুদ আহমদ, মওলানা বশিরুর রহমান এবং জনাব তাহের আহমদ বাচ্চু। রুটিন অনুযায়ী ক্লাস নেন মৌ. আবদুস সালাম, মৌ. সেলিম আহমদ কাজল, মৌ. শাহ আলম খান ও মৌ. তাহের আহমদ। উক্ত ক্লাসে আহমদনগর, শালশিড়ি, ভাতগাঁও, ডোহাভা, হেলেঞ্চাকুড়ি, চড়াইখোলা, মেনানগর, রংপুর এবং মাহিগঞ্জ জামা'তের মোট ৬৩ জন ওয়াকফে নও ও ২৫ জন মাতা যোগদান করেন। ক্লাস শেষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাস শেষে সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে ক্লাসের সমাপ্তি করা হয়।

*তাহের আহমদ*

## 'পাক্ষিক আহমদী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের পরিবর্তিত তারিখ'

**বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে 'পাক্ষিক আহমদী'র বিশেষ সংখ্যাটি অনিবার্য কারণ বশতঃ আগামী ৩১ অক্টোবর-২০১৩ প্রকাশিত হবে, ইনশাআল্লাহ। এ সংখ্যায় বাংলাদেশে আহমদীয়াত প্রতিষ্ঠার সূচনা ও বিস্তারের ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর নিবন্ধ, সচিত্র তথ্যাদি উপস্থাপন করা হবে।**

**বন্ধু, সুহৃদ, পাঠক ও লেখকগণের কাছ থেকে এ সম্পর্কিত লেখা, তথ্য ও আলোকচিত্র আহ্বান করা হচ্ছে।**

**আগামী ৩১ সেপ্টেম্বর-২০১৩ এর মধ্যে এ সম্পর্কিত নিবন্ধ, লেখা ও আলোকচিত্র সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী'র বরাবর প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল।**

**- সম্পাদক**

**পাক্ষিক আহমদী নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হউন।**

## ২৫ রমযানের মধ্যে তাহরিকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা পরিশোধ ও বিশেষ দোয়া প্রাপ্তি প্রসঙ্গে

আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদ দু'টি ঐশী সাহায্যপুষ্ট কর্মসূচী। খেলাফতে আহমদীয়ার অনুগত্যে এই কর্মসূচিগুলোতে বেশী বেশী ওয়াদা লিখিয়ে তা পরিশোধে বিশেষ বরকত লাভ হয়। আপনারা এও জানেন যে, রমযান একটি পবিত্র মাস এবং হাদীসে আছে যে, এ মাসে আল্লাহ্‌র রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঝড়ের গতিতে মালী কুরবানী করতেন। প্রতি বছরের মতো এবারেও হুযূর (আই.)-এর নিকট রমযান মাসে তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদের ওয়াদা সম্পূর্ণ পরিশোধকারীদের উদ্দেশ্যে দোয়ার জন্য পত্র লিখা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

এই উদ্দেশ্যে আপনাদের নিকট আহ্বান করা যাচ্ছে–

১। এই ঘোষণা আপনার জামা'তের সকল সদস্য, ছাত্র-ছাত্রী, পুরুষ বা মহিলা নির্বিশেষে নবজাতক থেকে বয়োবৃদ্ধ, সকলের নিকট পৌঁছান।

২। সকলকে ২৫শে রমযানের পূর্বেই নিজ নিজ লিখিত ওয়াদা পরিশোধ করতে উৎসাহিত করুন।

৩। যারা ওয়াদা লিখান নি, তাদেরকে ওয়াদা লিখিয়ে তা পরিশোধ করতে উৎসাহিত করুন।

৪। চেষ্টা করা উচিত যেন পূর্বের বছর হতে ওয়াদা ও আদায় বৃদ্ধি পায়।

৫। ২৫ রমযানের মধ্যে এরূপে তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদের সম্পূর্ণ ওয়াদা পরিশোধকারীদের নাম, ওয়াদা ও আদায়ের দু'টি পৃথক তালিকাসহ প্রতিবেদন কেন্দ্রে প্রেরণ করুন, যাতে করে হুযূর (আই.)-এর খেদমতে দোয়া চেয়ে সময় মতো প্রতিবেদন পেশ করা যায়। ন্যূনতম নিম্ন বর্ণিত মোবাইল নম্বরে মোট আদায় ও আদায়কারীর সংখ্যা এস.এম.এস করুন।

*শহীদুল ইসলাম বাবুল ও ইনসান আলী ফকির*
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
মোবাইল : ০১৭১৪-০৮৫০৭০

## ১৫তম বার্ষিক খুলনা বিভাগীয় ওয়াকফে নও ক্লাস ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ২১শে এপ্রিল ২০১৩ তারিখ হতে ২৫শে এপ্রিল ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ৫ দিন ব্যাপী ১৫তম বার্ষিক খুলনা বিভাগীয় ওয়াকফে নও সম্মেলন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সুন্দরবনের 'বায়তুস সালাম' মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। ২১ এপ্রিল সকাল ৯টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ওয়াকফে নও গাজী তাহের আহমদ এবং নযম পাঠ করেন ওয়াকফে নও মুহাম্মদ আফরাল ইসলাম। এতে সভাপতিত্ব করেন সহকারী ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও জনাব এস,এম, রবিউল ইসলাম। সভাপতির নসিহতমূলক বক্তব্যের মাধ্যমে সম্মেলনের উদ্বোধনী ঘোষণা করা হয়।

৫ দিন ব্যাপী ওয়াকফে নও সম্মেলনে তালিম তরবিয়তী ক্লাসে শিক্ষক হিসেবে শিক্ষাদান করেন মওলানা খোরশেদ আলম, মৌ. দাউদ আহমদ বোখারী, মৌ. শেখ আব্দুল ওয়াদুদ এবং এস,এম, তরিকুল ইসলাম।

প্রতিদিন বাদ মাগরিব ওয়াকফে নও এবং উপস্থিত পিতা-মাতাদের উদ্দেশ্যে পর্যায়ক্রমে তালিম তরবিয়ত বিষয়ক বিভিন্ন নসিহতমূলক বক্তৃতা প্রদান করা হয়। ক্লাস শেষে উপস্থিত ওয়াকফে নওদের মধ্যে তেলাওয়াতে কুরআন, নযম, দ্বীনিমালুমাত, বক্তৃতা, কুইজ, খেলাধূলা ইত্যাদি বিষয়ে এবং পিতা-মাতাদের মধ্যে দ্বীনিমালুমাত বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ২৫ এপ্রিল বিকাল ৩টায় ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও জনাব হালিম আহমদ হাজারির সভাপতিত্বে সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়। সভাপতির সমাপ্তি ভাষণ, পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত ওয়াকফ নও সম্মেলনে সুন্দরবন জামা'তের ৩৪ জন ওয়াকফে নও, ২৮ জন ওয়াকফে নও পিতা এবং ৩৪ জন ওয়াকফে নও মাতা উপস্থিত ছিলেন।

*এস,এম, রবিউল ইসলাম*

## দৃষ্টি আকর্ষণ

### পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাক্ষিক আহমদী'তে প্রতি মাসের শেষ সংখ্যায় পাঠকদের লেখা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে **'পাঠক কলাম'**। আগামী পাঠক কলামের বিষয়-

**"ইসলামে নারীর অবদান"**

আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে। লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।

**আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ২০ আগস্ট, ২০১৩-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।**

**লেখা পাঠানোর ঠিকানা-**

সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

## হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা

● কনের বাড়ীতে বিবাহ ভোজ সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন, যদি মেয়ে পক্ষের সাধ্য ও সামর্থ থাকে তাহলে সীমিত গন্ডিতে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ঋণ করে অন্যের দেখা-দেখি কখনও বড় ভোজের ব্যবস্থা করা উচিত নয়। সবকাজে তরবিয়তের দিকটা সামনে রাখা চাই। যাদের আর্থিক সামর্থ নেই তাদের কোনভাবেই হীনমন্যতায় ভোগা উচিত নয়।

● মেয়েদের চাকুরী করা সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন, আমি এক্ষেত্রেও ঢালাওভাবে অনুমতি দেই না। যদি কোন উপায় না থাকে সেক্ষেত্রে মহিলা চাকুরী করতে পারেন কিন্তু তা-ও করতে হবে পর্দার ভেতর থেকে। কোনভাবেই পর্দার মান পদদলিত হতে দেয়া যাবে না।

● পর্দার শর্ত সাপেক্ষে সহশিক্ষার অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু প্রত্যেককে ব্যক্তিগত ভাবে অনুমতি নিতে হবে।

● ফটো সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন, বিয়ের জন্য যদি ফটো দিতে হয় দিন কিন্তু পরে তা ফেরত নিতে হবে। পত্রিকায় কোন আহমদী মহিলার ছবি ছাপা ঠিক হবে না।

এ বিষয়গুলো জামা'তের সর্বস্তরের সদস্যদের অবগতি ও প্রতিপালনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

[সূত্র : জি.এস/আমুজাবা/৭১৮, তারিখ: ২৫/১১/২০০৯]

# শুভ বিবাহ

গত ১২/০৪/২০১৩ তারিখে আয়েশা আক্তার, পিতা-মোহাম্মদ জাহেদুল হক, চাকদার, ব্লক ডি, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬, বাংলাদেশ-এর সাথে সানাউল হক রিংকি, পিতা-নিজামুল হক, ২৬ তাহির-ষ্ট্রিট, ম্যাপলি-এর বিবাহ CDN $ 10,477.95. মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১০৮১/১৩

গত ১৭/০৫/২০১৩ তারিখে হোসেনা আরা, পিতা-মোহাম্মদ আবুল কাশেম, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, মিরপুর-এর সাথে সোহেল আহমদ, পিতা-মোহাম্মদ বশিরউদ্দিন, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ইসলাম গঞ্জ-এর বিবাহ ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১০৮২/১৩

গত ১০/০৫/২০১৩ তারিখে মেহেদী করিম রিতু, পিতা-আলহাজ্জ রেজাউল করিম, তেবাড়ীয়া দক্ষিণ পাড়া, নাটোর-এর সাথে আবেদ আলী মোল্লা, পিতা-নুরে আলম সিদ্দিকী, তেবাড়ীয়া দক্ষিণ পাড়া, নাটোর এর বিবাহ ২,৫০,০০০/- (দুইলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১০৮৩/১৩

গত ১১/০৫/২০১৩ তারিখে শাকিলা খাতুন লীনা, পিতা-মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, মুসলিম পাড়া চুয়াডাঙ্গা এর সাথে মোবারিজ আহমদ সানি, পিতা মৃত-মোবারক আহমদ (ইন্টু), কান্দিপাড়া-এর বিবাহ ১,০০,০০০/- (একলক্ষ) টাকা মোহরনায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১০৮৪/১৩

গত ১৯/০৪/২০১৩ তারিখে মৌসুমী আক্তার মিশু, পিতা-মোহাম্মদ আলী, তালশহর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর সাথে মোহাম্মদ নাহিদ আহমদ (রানা) পিতা মরহুম-নাজির আহমদ কান্দিপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর বিবাহ ২,০০,০০০/- (দুইলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১০৮৫/১৩

গত ২৫/০৩/২০১৩ তারিখে মৌসুমী আক্তার, পিতা-মোহাম্মদ সাঈদ সানা যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা-এর সাথে মোহাম্মদ অজিয়ার রহমান মোড়ল পিতা মৃত-রশিদ মোড়ল যতীন্দ্রনগর-এর বিবাহ ৩৫,০০০/- (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১০৮৬/১৩

গত ১৪/০৪/২০১৩ তারিখে সোনিয়া আক্তার, পিতা-মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, পঞ্চগড়-এর সাথে বুলন আহমদ, মোহাম্মদ, পিতা-মোহাম্মদ মতি মিয়া, আহমনগর-এর বিবাহ ৫১,১০১/- (একান্ন হাজার একশত এক) মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১০৮৭/১৩

গত ১৪/০৪/২০১৩ তারিখে শাবনুর আক্তার, পিতা-মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক সরকার-এর সাথে মহারাজপুর পুকুর পাড়-এর সাথে মোহাম্মদ শাকিব খান সোহাগ, পিতা-মোহাম্মদ হযরত আলী, তেবাড়িয়া, নাটোর-এর বিবাহ ৫৫,০০০/- (পঞ্চান্ন হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১০৮৮/১৩

গত ১৮/০১/২০১৩ তারিখে ফাতেহা মুন্নী, পিতা-আব্দুল হাকীম, হাজিপুর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী-এর সাথে মোহাম্মদ তারেক আহমদ, পিতা-মোহাম্মদ সালাউদ্দিন, শৈলমারী, চুয়াডাঙ্গা এর বিবাহ ৫০,০০১/- (পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১০৮৯/১৩

গত ১৫/০৬/২০১৩ তারিখে মালিহা মুছা, পিতা-মোহাম্মদ মুছা মিয়া, ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর সাথে জামালউদ্দিন আহমদ, পিতা-সালাউদ্দিন আহমদ, উত্তর আহমদী পড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর বিবাহ ২,৫০,০০০/- (দুইলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১০৯০/১৩

গত ০২/০৬/২০১৩ তারিখে উম্মে কুলসুম মনিরা, পিতা-মোনায়েম হোসেন, নতুন বাজার কলোনী, নীলফামারি-এর সাথে মোহাম্মদ লোকমান (বাবু), পিতা-মোহাম্মদ ইসমাইল, ফিরোজশাহ, চট্টগ্রাম-এর বিবাহ ১,০০,০০০/- (একলক্ষ) টাকা মোহরানায় সসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১০৯১/১৩

গত ১৮/০৫/২০১৩ তারিখে সুমী আক্তার, পিতা-মোহাম্মদ শরীফ আহমদ, বায়জিদ বোস্তামী রোড, চট্টগ্রাম-এর সাথে মোহাম্মদ ফারুক আহমদ, পিতা মরহুম- আব্দুল মজিদ মিয়া, ২৭৫, পূর্ব নাখালপাড়া-এর বিবাহ ২,০০,০০০/- (দুইলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং– ১০৯২/১৩

## সংবাদ প্রেরণকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ

**পাক্ষিক আহমদী পত্রিকায় জামা'তী এবং বিভিন্ন অঙ্গ-সংগঠনের সংবাদ প্রেরণকারীদের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ:**

**১। যে সংবাদটি প্রেরণ করছেন তা সংবাদ আকারে মূল বিষয় বস্তু প্রেরণ করার চেষ্টা করুন।**

**২। পাক্ষিক আহমদীতে প্রকাশের জন্য সংবাদটি পাক্ষিক আহমদীর ঠিকানায় আলাদাভাবে পাঠাতে হবে।**

**৩। লেখা স্পষ্ট হতে হবে।**

**৪। প্রয়োজনে পাক্ষিক আহমদীর ই-মেইলে সংবাদ পাঠাতে পারেন।**

*সম্পাদক*
পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার, রোড ঢাকা-১২১১
ই-মেইলঃ pakkhik_ahmadi@yahoo.com

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

# বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১ প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২ প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩ সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪ রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫ রাব্বানা লা তুযিগ ক্বুলূবানা বা'দা ইয্ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্'হাব [সূরা আলে ইমরান– ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬ আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭ আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯ দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আই.)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

*বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষীকি জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত*
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

New Vol. No. 76 | 1st Issue

# The Ahmadi
Fortnightly

15th July, 2013 Tk. 18.00
Regd. No. D. A.-12

সেই ১৯৮৮ সাল থেকে

ধানসিড়ি রেস্তোরা

**ধানসিড়ি রেস্তোরা-১**
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

**ধানসিড়ি খাবার**
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"
মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta

CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com